২২ আগস্ট ১৯৮৪ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

এই সংখ্যায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়া

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প

'স্কুলের কথা' পর্যায়ে

পাঠভবন

শুধুমাত্র দুধ থেকে শক্ত আহারের দিকে পরিবর্তন
আপনার বাচ্চার পক্ষে সহজতর করে তুলুন...

নেস্টাম: সহজতর পরিবর্তনের উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী বেবী সিরিয়াল।

আপনার শিশুর জন্যে সবসেরা জিনিষটিই আপনার চাই। সেই জন্যেই আপনি তাকে বুকের দুধ খাওয়ান —যা সবচেয়ে বেশী পুষ্টিকর ও সহজে হজম হয়।

যখন তার বয়স প্রায় চারমাস তখন তার শক্ত আহারেরও প্রয়োজন। কিন্তু তার হজমশক্তি তখনও অত্যন্ত কোমল। তখন তার প্রয়োজন এমন একটি সিরিয়াল যা সে সহজে হজম করে। যেমন, নেস্টাম।

প্রথম শক্ত আহার হিসেবে নেস্টাম আদর্শ কারণ তা চাল থেকে তৈরী। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে অন্যান্য যে কোনও সিরিয়াল থেকে নেস্টাম-ই হল সহজ পাচ্য।

দুধের সঙ্গে প্রস্তুত করলে, নেস্টাম পুষ্টির দিক থেকে সম্পূর্ণ খাদ্যে পরিণত হয় আর এতে থাকে অতি প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টিকর পদার্থ। শিশুর ত্বককে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে, তার দৃষ্টিশক্তিকে সচ্ছ ক'রে আনতে এবং তার রোগ প্রতিরোধের সহজাত ক্ষমতা বাড়াতে এতে রয়েছে সেইসব ভিটামিন। নেস্টামে যে আয়রণ আছে, তাতে রক্ত বিশুদ্ধ রাখে, এর ক্যালসিয়ামে করে হাড় ও দাঁত শক্ত।

দুধের সঙ্গে নেস্টামের ব্যবহার বহুমুখী। তা'ছাড়া সেদ্ধ ফল, রান্না করা ও চটকানো তরকারী এবং ডালের সঙ্গেও নেস্টাম দেওয়া চলে।

বিনামূল্যে!

আপনার শিশু তার খাবারে বৈচিত্র্য পছন্দ করে। অতএব বিনামূল্যে নেস্টাম রেসিপি ফোল্ডারের জন্যে লিখুন:
নেস্টাম
পোষ্ট বক্স নং 6016 নিউ দিল্লী 110 008

আয়রণ ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ

তৈরী করা খুব সোজা।

আগে ফোটানো কুসুম-গরম দুধ ঢালুন। | নেস্টাম মিশিয়ে নিন। | এবার খেতে দিন।

নেস্টাম
বেবি সিরিয়্যাল

দুধের সঙ্গে মেশান

NESTLÉ

SAA/FSL/N/3150 BEN

SAA/FSL/N/3150 BEN

আনন্দমেলা

৬ ভাদ্র ১৩৯১ □ ২২ আগস্ট ১৯৮৪ □ ১০ বর্ষ ৪ সংখ্যা

উপন্যাস
পোড়োখনির প্রেতিনী (প্রথমাংশ) । সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৩২
গল্প
পুচনের খরগোশ । অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫
টান । চন্দ্রভানু ভরদ্বাজ ৯
লেভেলক্রসিং । সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ১৩
কবিতা ও ছড়া
শিঘ্রি শিঘ্রি । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৮
সাহসিনী । শিবানী দাশ ৮
তিন রকম । অমলকান্তি ঘোষ ১৯
দুটি ছড়া । সুভাষপ্রসন্ন ঘোষ ২৭
ব্যস্তবাগীশ । শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় ২৭
গুরু-শিষ্য । রথীন্দ্র সেনগুপ্ত ৫৯
সাক্ষাৎকার । রতনতনু ঘাটী ৫৯
ধারাবাহিক উপন্যাস
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৬
শার্লক হোমসের গল্পমালা
বোহেমিয়ায় কেলেঙ্কারি । অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন ৫৩
ইতিহাসের গল্প
বেগমের বরাদ্দ পাঁচ টাকা । প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ৫১
স্মৃতিকথা
ব্যাটে-বলে । পঙ্কজ রায় ৬২
লেখাপড়া
পাঠভবনের প্রধানা শিক্ষিকা কী বলেন । অপরাজিতা ১৮
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ১৯
বাংলা বলো । বাচস্পতি ২৫
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ২৫
বিজ্ঞানবিচিত্রা
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৬৩
খেলাধুলো
মহারণে জয় মোহনবাগানের । অশোক রায় ৬৪
ক্যারিবিয়ানরা সিরিজ জিতল । মণীশ মৌলিক ৬৫
মহমেডান-ইস্টবেঙ্গল ১-১ । সুব্রত সিংহ ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
টিনটিন ২০-২১, রোভার্সের রয় ২২-২৩, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০, ফ্ল্যাশ গর্ডন ৬১
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা-মজা-শব্দসন্ধান ২৯-৩০, তোমাদের পাতা ৪৯

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

এবারের বর্ষায় কলকাতা

বর্ষা এলেই কলকাতা শহর জলে ডোবে। কেন বলতো ?

তার কারণ কলকাতা শহরের ভূগঠন অনেকটা ঠিক বেসিনের মত। চারপাশ উঁচু আর মাঝখানে গর্ত। ফলে জমা জল গড়িয়ে কোথাও যেতে পারে না। অন্যদিকে শহর কলকাতার জল নিকাশী পয়ঃপ্রণালী (মাটির তলার নালা) তৈরী হয়েছিল আজ থেকে একশ বছর আগে, সাহেবদের আমলে। তখন শুধু চৌরঙ্গীর চারপাশ জুড়েই শহর ছড়িয়ে ছিল। তাই রাস্তাঘাটই বলো, মাটির তলার নিকাশী নালাই বলো আর ট্রামবাস চলাচলই বলো সবই এই এলাকাটুকুর কথা ভেবে তৈরী হয়েছিল।

১৯২৪ সালে কলকাতা থেকে রাজধানী উঠে চলে যায় দিল্লী। তারপর থেকে কলকাতা শহরে উন্নয়নের কোন কাজই হয়নি। এরপর এসেছে দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা। ১৯৪৭ সাল। পূর্ববঙ্গ (আজকের বাংলাদেশ) থেকে দিনে কয়েক লক্ষ করে মানুষ নিয়মিত এসে উঠেছেন কলকাতায়। তাঁদের আশ্রয় দিতে ও খাবার যোগাতে রাজ্যের সরকার হিমসিম খেয়েছেন। সেদিনের দুর্দশার কথা আজ আর বলে বোঝানো যাবে না। কলকাতা শহর এই সময় বেড়ে উঠেছে বেঢপভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে। এই পরিস্থিতিতে যদি সরকারের হাতে অনেক টাকা থাকতো তবে শহর উন্নয়নের কথা ভাবা যেতো। কিন্তু তাতো ছিল না।

সত্তর সালে সি এম ডি এ-র জন্ম হবার পর শহর উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। তার মানে প্রায় পঞ্চাশ বছরের জমানো কাজ হাতে নিয়ে নামতে হয়েছে। এর মধ্যে মাটির তলার পাইপগুলোতে মর্চে পড়ে, পলি জমে, ভেঙ্গে একাকার হয়ে আছে। কলকাতা শহর কিছুদিন বন্ধ করে রেখে, মাটি খুঁড়ে ফেলে মোটা মোটা ৭২" ইঞ্চি পাইপ বসিয়ে, পলি সরিয়ে কাজ করতে পারলে জলদি সুরাহা হতো। কিন্তু তাতো করা যায় না। শহরকে চলতে দিয়েই এখানে ওখানে টুকটাক কাজ করা। তাই বড় রকমের বৃষ্টি হলেই শহর জলে জল। তোমাদের "রেনি ডে"। যেমন এ বছর বর্ষার শুরুতেই কলকাতা জলজমাট হয়ে গেল। এ বছর অনেক জায়গায় পাম্প বসিয়ে জল সরানো হয়েছে। আসলে বন্দর হিসেবে কলকাতা খুব ভাল ছিল বটে, তবে জায়গাটা নীচু তো ? তাই বর্ষা বেশী হলে কলকাতায় জল জমবেই। চেষ্টা করা হচ্ছে জল জমলে তা যাতে তাড়াতাড়ি সরে যায় সে ব্যবস্থা করার।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ ৩এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

আনন্দমেলা

ছোটদের সেরা
রঙিন পূজাবার্ষিকী

উপন্যাস

সমরেশ বসু
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
মতি নন্দী
বুদ্ধদেব গুহ
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
শৈলেন ঘোষ

এছাড়া তোমাদের প্রিয় আরও একজন লেখকের আরও একটি উপন্যাস

কবিতা ও ছড়া

প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, সুনির্মল বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

গল্প

মনোজ বসু, বিমল মিত্র, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, লীলা মজুমদার, বিমল কর, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সমরেশ মজুমদার, সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, শিবশঙ্কর মিত্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

সুকুমার সেনের
'পূজার পাঁচালি'

চিত্রকাহিনী 'ভুতুড়ে জুতো'

পরীক্ষার্থীদের জন্য
'কী করে নম্বর বাড়াতে হয়'

খেলাধুলা নিয়ে
রাজু মুখোপাধ্যায়ের লেখা

সেইসঙ্গে ধাঁধা, শব্দসন্ধান ও আরও অজস্র আকর্ষণ।

দাম ২৪ টাকা
রেজিষ্টার্ড পোস্টে
২৭.৯০ টাকা

ফটো টাইপ সেটিংএ
অফসেট পদ্ধতিতে ছাপা
অনবদ্য লেখায় ঠাসা
পূজাবার্ষিকী।

CLARION C-ABP-AM-2

পুচনের খরগোশ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

'না দিদিমণি, আমি আর পারছি না। পরে কিছু হলে সব দোষ আমার, কোনো কথা শোনে না। বারবার বলি ছাদে উঠবে না—কে শোনে! তুমি বারবার করে বলে যাও, আমি কোন্‌দিকে সামলাই বলো!'

সাবিত্রী স্কুল থেকে ফিরেই শুনল সব। এক নাগাড়ে সব অভিযোগ পুচনের বিরুদ্ধে। পুচন মাকে জড়িয়ে ধরে আছে। 'মা, আমাকে কোলে নাও' বলছে। সাবিত্রী ছাতা ব্যাগ সেন্টার টেবিলে রেখে মুখের ঘাম আঁচলে মুছছিল। পুচনকে শুধু বলল, 'না কোলে নেব না। তুমি কারো কথা শোনো না।

'আর ছাদে উঠব না। দৌড়াব না। বলছি তো। আমাকে কোলে নাও না মা।'

সাবিত্রী আর পারে না। কোলে নিয়ে বলল, 'সত্যি আর উঠবে না তো!'

পুচন মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে বলল, 'সত্যি।'

কিন্তু মা স্কুলে চলে গেলে সে বড় একা। বাবা সকাল আটটা না বাজতেই অফিস। মা দশটা না বাজতেই স্কুল। এত বড় বাড়িটায় সে আর মণিপিসি। আর কেউ না। সে যা চায়, মা এনে দেয়। সে দুটো খরগোশের বাচ্চা চেয়েছিল, তাও মা এনে দিয়েছে। বাবা বলেছে, আর কটা মাস, স্কুলে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

পুচনের মুখ তখন গম্ভীর হয়ে যায়। সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। নানু বিনুকে কোলে নিয়ে খাটের তলায় ঢুকে যায়। একটা দুটো করে ঘাস দেয়—কুটকুট করে খায়। ভারী মজা লাগে। সে যখন খায়, এই যেমন দুধ পাউরুটি ডিম কলা সন্দেশ, সে খেতে খেতে দেখতে পায়, ওরা ওর মায়ের কাছে বসে আছে। বন্ধু কিংবা সঙ্গী বলতে এই দুজনই এখন তার আছে। নরম সাদা ফুলের মতো দুটো জ্যান্ত প্রাণীর সঙ্গে তার তখন যত কথা।

মা-বাবা বাড়ি থেকে চলে গেলেই সদর বন্ধ। একটা খাঁচার মতো মনে হয় বাড়িটাকে। সামনে মাঠ, খালের জল, কোথা থেকে আসে সব খড়ের নৌকা। সে শুধু তাকিয়ে থাকে। গুন টেনে নিয়ে যায় কারা নৌকাগুলি। একটা লোক পাটাতনে দাঁড়িয়ে থাকে। দূরের ইশারা সে খুঁজে পায়। ছইয়ের পাতায় কোনোদিন সে দেখতে পায়, কেউ বসে আছে। নিবিষ্ট মনে হুঁকা খাচ্ছে। ছাদে উঠে গেলে পৃথিবীটাকে খুব বড় লাগে তার।

সে একদিন ছাদে বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। খালে খড়ের নৌকা—দুটো লোক দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ছইয়ের মাথায় বসে লোকটা নিবিষ্ট মনে কী খাচ্ছে। সে বলেছিল, 'দ্যাখো বাবা, ঐ দ্যাখো না লোকটা...'

বাবা বলেছিল, 'হুঁকা খাচ্ছে।'

সেই থেকে সে হুঁকা কী বস্তু বুঝে ফেলেছিল। 'বাবা আমাকে হুঁকা দেবে। খাব।'

বাবা বলেছিল, 'বড় হলে খাবে।'

ছাদে দাঁড়ালেই সে পৃথিবীর অনেক খবর পেয়ে যায়। ঐ দূরে যে-সব গাছ, ওগুলি বাবা বলেছে ঝাউয়ের বন। আরও দূরে সাদা ফুল ফুটে থাকে—বাবা বলেছে, ওগুলো কাশফুল। নৌকা দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে, ওটাকে গুনটানা বলে। কত সব নতুন কথা, কত রকমের সব পাখি, কত সব নাম সে বড় হতে হতে শিখে ফেলেছে। ছাদে না এলে, কিংবা কোথাও মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে না গেলে জানতে পারত না। নানু বিনুরও শখ বড় ছাদে ওঠার। দরজা খোলা পেলেই ওরা ছাদে দৌড়ে চলে আসে। সে তাদের নিয়ে তখন দৌড়ায়, খেলা করে। ছাদের কার্নিশে ঝুঁকে নীচের মানুষজন দেখতে তার বড় ভাল লাগে। মা আসার সময় সে ছাদে না উঠে থাকতেই পারে না। ভি আই পি'র রাস্তায় সব কত রকমের বাস ট্রাক ট্যাকসি, যায়। হরদম যাচ্ছে। জানালায় দাঁড়ালে দেখা যায় না। মা আসবে তার। মোড়ে বাস থেকে মানুষজন নামে। এত সব মানুষজনের মধ্যে যত দূরেই হোক—মাকে সে চিনে ফেলতে পারে। এই চিনে ফেলার মধ্যেও তার যে কী আনন্দ। মা আসছে, মা আসছে—সে শুধু তখন লাফায়। নীল রঙের ছাতার নীচে মা'র দ্রুত হেঁটে আসার মধ্যে সে টের পায় যেন বাড়িতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে—যত দ্রুত সম্ভব মা'র তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছানো দরকার। এমন একটা রহস্যময় ছাদের দরজা যদি মণিপিসি বন্ধ করে রাখে কার না রাগ হয়। মা বলে গেছে, 'মণি, তোমাকে বার বার বলছি, ছাদ খোলা রাখবে না।'

ফলে দুদিন থেকে ছাদের দরজা বন্ধ। দুপুরে ঘুম থেকে উঠে হাই উঠছিল। সে ঘড়ি দেখতে শিখেছে। দুটোও বাজেনি। মণিপিসি মেঝেতে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। আঁচল থেকে চাবিটা খুলে নেবার তার দুষ্টুবুদ্ধি জাগল। কিন্তু এ কী, মণিপিসি তার ভয়ে চাবিটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। কী আর করে। নানু বিনু দরজার কোনায় কুটকুট করে কী খাচ্ছে। তাকে নেমে যেতে দেখেই পায়ে পায়ে তারা এগিয়ে আসে। সে কিছুক্ষণ কী ভাবল। বারান্দার গ্রিল বেয়ে উঠল। তারপর কী নাগাল পেতেই দেখল ছিটকিনি খুলে গেছে। সদর আলগা হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে নানু বাইরে লাফিয়ে পড়ল। সে ডাকল, 'নানু, নানু যাস না। মা বকবে।' কে শোনে কার কথা। নানু সামনের মাঠটা খালি পেয়ে ছুটছে।

সে ডাকছে, 'নানু নানু, ভাল হবে না। দাঁড়া বলছি। মা এলে আমাদের আস্ত রাখবে না। কেউ বাড়ি না থাকলে, একা বাইরে যেতে নেই।'

ঘাসের ঝোপের মধ্যে কোথায় যে লুকাল! সে কাছে যেতেই দেখল নানু এক লাফে আরও দূরে সরে গেছে। পুচন আর পারে না। সদর খোলা পেয়ে বিনুটা পর্যন্ত নেমে এসেছে। দুটোই এখন মাঠ পার হয়ে খালপাড় ধরে ছুটছে

সে যত দৌড়ায়, ওরা তার চেয়ে বেশি ছোটে। সে রাগে দুঃখে বলল, 'আসুক না বাবা, আজ তোমাদের কপালে দুঃখ আছে।' সে এবার দৌড়ায় না। গুঁড়ি মেরে এগোতে থাকে। সামনে সব ঝোপজঙ্গল। ঠিক ও দুটো কোথাও ওখানে লুকিয়ে পড়েছে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখল, সব ফাঁকা। সে জঙ্গল হাঁটকে দেখল নেই। ওর ভয় ধরে গেল। বাড়ি থেকে একা সে কখনও অতদূর চলে আসেনি। সামনে সেই ভি আই পি রাস্তা। দু-পাশে বড় বড় গাছ, বনের মধ্যে ও দুটো ঢুকে পড়লে ভগবান, কী হবে! সে কাতর গলায় শুধু নাম ধরে ডাকতে থাকল। একটা লোক রুদ্রাক্ষের মালা গলায় লুঙ্গি পরনে এগিয়ে আসছে। মা বলেছে, এরা ভাল হয় না। ছেলেধরা হয়। সে তাড়াতাড়ি টুপ করে একটা ঝোপের মধ্যে বসে পড়ল। আর মনে হচ্ছিল, কখন না লোকটার লম্বা হাত এগিয়ে এসে তার চুলের মুঠি ধরে ব্যাগে ভরে ফেলে। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা আপন মনে গান গাইতে গাইতে খালের পাড় ধরে হেঁটে চলে গেল। সে বলল, ধুস, মা যত ভয় দেখায়! লোকটা কত ভাল। সে ডাকল, 'হেই!' লোকটা দাঁড়াল এতটুকুন ছেলে খালের পাড়ে দেখে যেন ঘাবড়ে গেল। বলল 'ও খোকা, তুমি এখানে কী করছ? তোমার মা নেই!'

'মা থাকবে না কেন। তুমি খরগোশ দেখেছ!'

'না তো।'

তারপর পুচনকে বলল, 'বাড়ি যাও। মা তোমার ভাববে।' লোকটা কত ভাল। মানুষজন সব খারাপ, কেবল ভয় দেখানো। পুচনের মানুষ সম্পর্কে লোকটার কথাবার্তায় ভারী আত্মবিশ্বাস জন্মে গেল। সে বলল, 'ও দুটো না নিয়ে যাই কী করে। যদি চাপা পড়ে। বেড়ালে খেয়ে ফেলে!'

লোকটা বলল, 'সত্যি ভয়ের কথা তবে। ও দুটো কী?'

'দুটো খরগোশের বাচ্চা। পালিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে।'

'তা হলে ঠিক এখানে-সেখানে আছে। খুঁজলেই পেয়ে যাবে।' বলে লোকটা আর দাঁড়াল না। হনহন করে হেঁটে চলে গেল। লোকটার সঙ্গে দেখা না হলে সে ততক্ষণে কেঁদে ফেলত। কিন্তু লোকটা তাকে কত বড় ভরসা দিয়ে গেল—খুঁজলেই পেয়ে যাবে। সে খালের পাড় ধরে হাঁটছে আর একটা কী যেন বাজাচ্ছে—ভি আই পি রাস্তার কাছে আসতেই দেখল, পাজি দুটোর কী মজা সোজা রাস্তা ধরে ছুটছে। সেও কম যায় না। সেও তাদের ধরার জন্য ভি আই পি-তে উঠে গেল! এদিকে গাড়ি সব দ্রুত যারা ছুটিয়ে আসছে তারা অবাক, এত বড় একটা গাড়ি-চলাচলের রাস্তায় কিনা একটা ফুটফুটে শিশু আর দুটো খরগোশ পাল্লা দিয়ে দৌড়াচ্ছে যা হয়ে থাকে, এই চাপা পড়বে, আরে গেল গেল! থামাও গাড়ি কী সর্বনাশ! কাদের ছেলে! মা-বাবারই বা কী আক্কেল। লোকজন নেমে ছুটতে থাকে। গাড়ি জ্যাম হয়ে যায়। কেউ উপভোগ করছে শিশু আর খরগোশের নির্ভীক পৃথিবীর সৌন্দর্য!

বাস থেকে নেমেই সাবিত্রী শুনল, খেয়াঘাটের ওদিকটায় একটা বাচ্চা দুটো খরগোশের পেছনে ছুটে যাচ্ছে। সাবিত্রী ভিরমি খেতে গিয়ে ভাবল, ও ঠিক তার পুচন হবে। ভিরমি খায় কী করে! ছাদের দরজা বন্ধ বলে বাইরের পৃথিবী দেখতে বের হয়ে পড়েছে! যখন ছুটে সেই বনটার পাশে গেল, দেখল

লোকজনের ভিড়। ওরা পুচনকে জোর করে ধরে রেখেছে। মাকে দেখেই কেঁদে ফেলল পুচন, 'মা. বিনু নানু না, ওরা না ...মা, জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকে গেল।'

অনেকে জঙ্গলটার মধ্যে খোঁজাখুঁজি করে পেল না। ওরা হতাশ গলায় বলল, 'না, পাওয়া গেল না। আপনার ছেলে? কী দস্যি ছেলে রে বাবা!' কিন্তু পুচন তেমনি হাউহাউ করে কাঁদছে। ও দুটোকে না নিয়ে গেলে বেড়ালে খেয়ে ফেলবে। সে বলল, 'ওদের এনে দাও মা। আমি আর দুষ্টামি করব না।'

সেই লোকটা তখন হাজির গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বলল, 'কী সুন্দর বোগেনভেলিয়ার জঙ্গল কত লাল সাদা ফুল ফুটে আছে। এমন সুন্দর জঙ্গল ছেড়ে ওরা ঘরে থাকবে কেন পুচনবাবা! দেখো. ফুলগুলি কেমন বাতাসে সব প্রজাপতির মতো উড়ে যাচ্ছে!'

সে-রাতে সবিত্রী পুচনকে কিছু খাওয়াতে পারল না পুচন কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল সে স্বপ্ন দেখল. এক সুন্দর নীল ফুলের উপত্যকা সেখানে খরগোশ দুটো আপন মনে খেলা করে বেড়াচ্ছে। দুটো সাদা বাঘ শুয়ে আছে। খরগোশ দুটো বাঘের পিঠে লাফ দিয়ে উঠছে আবার নেমে যাচ্ছে। তারপর এল কোত্থেকে সব ছবিতে দেখা বন্য প্রাণী। জিরাফ, উট, গণ্ডার, হাতি, বাঘ এমনকী একটা ইঁদুর পর্যন্ত। বনভূমিতে ওরা খরগোশ দুটোকে গাছপালা প্রজাপতি পাখির নাম মুখস্থ করাচ্ছে। ঠিক তার বাবার মতো। সকালে ঘুম থেকে উঠে পুচনের কেন জানি আর কোনো দুঃখ থাকল না। সে স্বপ্নে দেখেছে ওরা সেখানে ভারী আনন্দে আছে। যেখানে যাকে মানায়।

ছবি প্রণবেশ মাইতি

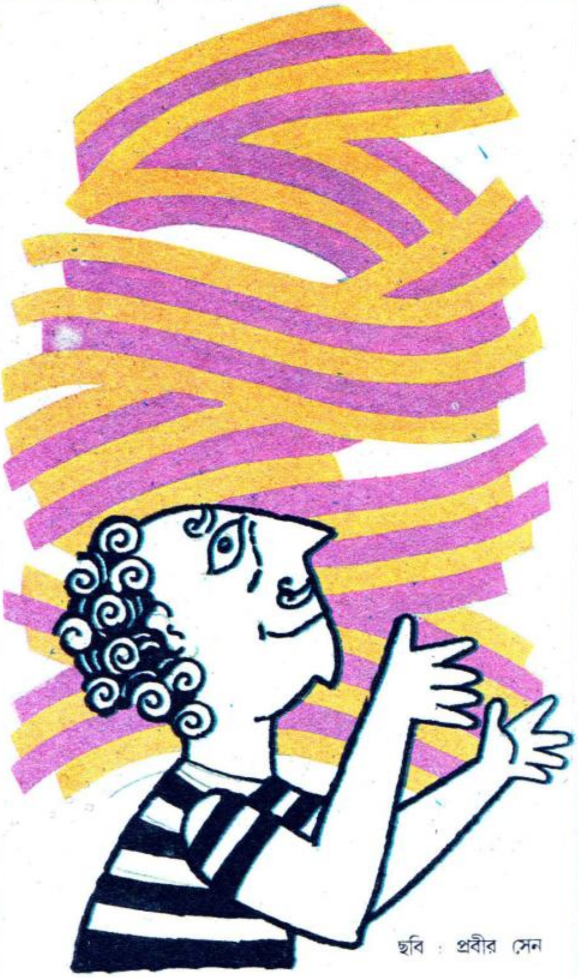

ছবি : প্রবীর সেন

শিঘ্রি শিঘ্রি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পাঁশকুড়া তমলুক হলদিয়া
ভাল চাস যদি তবে বল, 'জি হাঁ।'

মহিষাদল ময়না গেঁওখালি
গান যে গায়, দিচ্ছে সেও তালি।

হিজলি কাঁথি দাঁতন ঘাটাল
কিলিয়ে কেউ পাকায় কাঁঠাল ?

সুতোহাটা দাসপুর দিঘা ডিগরি
বাছাধন, বাড়ি যাও শিঘ্রি শিঘ্রি।

সাতশোল ঝড়ভাঙা কেশপুর
এখান থেকে, আজ্ঞে, বেশ দূর ॥

সাহসিনী

শিবানী দাশ

পর্বত-আরোহিণী বাচেন্দ্রি পাল,
এভারেস্ট তাঁর কাছে হয়েছে নাকাল।
আমাদের আশা আছে
অচিরেই তাঁর কাছে
আরও-আরও গিরিচূড়া মানবেই হার,
এমন সাহস আছে কোন্ মেয়েটার।
পাহাড়ে ওঠেন যিনি,
অধ্যাপিকাও তিনি,
ছোটখাটো, তবু খাটো নন কারও চেয়ে,
দেশের গর্ব এই সাহসিনী মেয়ে।

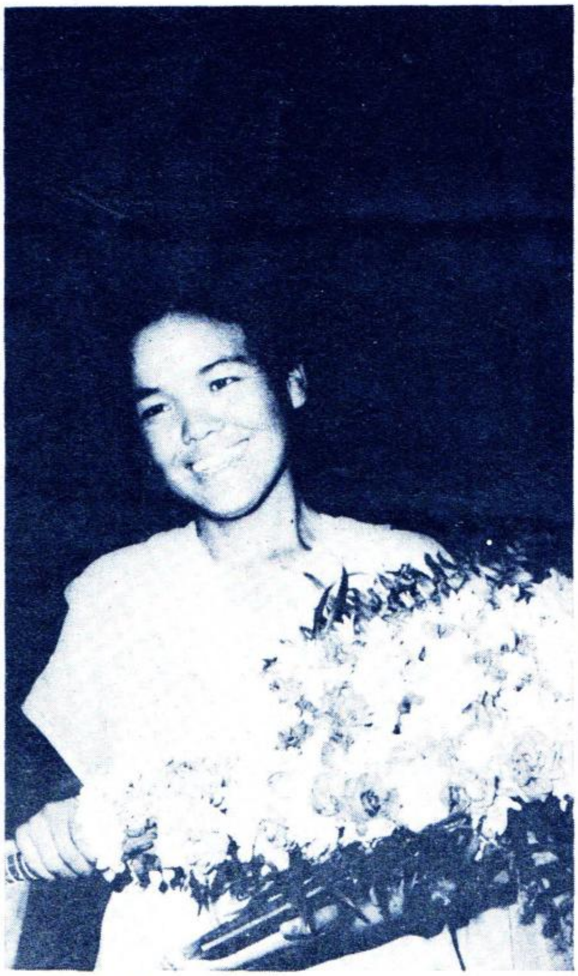

এভারেস্ট-বিজয়িনী প্রথম ভারতীয় মেয়ে বাচেন্দ্রি

টান

চন্দ্রভানু ভরদ্বাজ

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল অতনুর। একলা নিজের ঘরে শুয়ে থাকা অনেক দিনের অভ্যেস। কবে থেকে যে সে-অভ্যেসটা হয়েছে, ওর মনে পড়ে না। শোবার ঘরটা বেশ বড়ই। পুবদিকের ছোট ঘরটা ওর পড়ার ঘর। আর এপাশে বারান্দা পেরিয়ে উল্টোদিকেই 'নমিপিসির ঘর

ঘর অন্ধকার। কত রাত্রি হয়েছে কে জানে।

অতনুর ঘুম ভেঙে গেছে অদ্ভুত এক কষ্টে। অতনু বোঝবার চেষ্টা করল এমনটা হচ্ছে কেন।

কালকের স্কুলের কতক টাস্ক বাকি ছিল। খাওয়াদাওয়ার পর সেগুলো শেষ করে ও যখন শুতে যায়, তখন রাত এগারোটা, ওর স্পষ্ট মনে আছে। বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছিল। বেশ একটা ঠাণ্ডার আমেজ আর মাথার ওপর বন্ বন্ ঘোরা পাখা, দারুণ আরামে অতনু ঘুমিয়ে ছিল পাখাটা এখনও ঘুরছে, আর বাইরে বৃষ্টিটা বেড়েছে নিশ্চয়। হু হু ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ছাট এসে পড়ছে খোলা জানলা দিয়ে। অথচ অতনুর যে কেন এমন লাগছে। দ্রুত, খুব দ্রুত এমন অস্বাভাবিক কষ্টটা বাড়ছে কেন, কিছুতেই বুঝতে পারছে না। ওর বোধবুদ্ধি যে পুরোমাত্রায় সজীব রয়েছে এটা নিশ্চিত। এই তো ও হাত বাড়িয়ে নীল আলোটা জ্বালাল।

চারিদিকে এত হাওয়া, ঘরের বড় বড় চারটে জানলা খোলা, ঝোড়ো হাওয়ায় সব কিছু যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তবু অতনুর কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছে

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন ! নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি । দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম ।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই । এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে ।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি । আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে ।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক । একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায় ।

মাত্র
টা. ৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

[illegible] লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568 BEN

যেন প্রচণ্ড ধোঁয়ার মধ্যে ও ডুবে যাচ্ছে, শ্বাস নিতে পারছে না, চোখ জ্বালা করছে আর উত্তাপ। ঘরের মধ্যে একটুও ঠাণ্ডা নেই বুঝি। আগুনের ঝলসানো তাপ, প্রচণ্ড হল্‌কায় যেন শরীর পুড়ে যাবে! দরদর করে ঘামছে অতনু। ব্যাপারটার তীব্রতা এত দ্রুত বাড়ছে যে, অতনু তাল রাখতে পারছে না। কী করবে, সেই বোধটুকুই যেন হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ পাশাপাশি যেন ওর আরেকটা সত্তা ক্রমশই সচেতন হয়ে উঠছে। সেই আসল অতনু বলছে, 'কিছুই তো ঘটেনি, তুমি তো তোমার ঘরে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার মধ্যেই রয়েছ!'

অবশ হয়ে আসা শরীরটা টেনে নিয়ে অতনু নামতে চেষ্টা করল বিছানা থেকে। শরীরের ওপর ওর নিয়ন্ত্রণ নেই, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসছে। একটু জল! ওই তো বেড্‌সাইড টেবলে জলের গ্লাস। কিন্তু ও জল বুঝি অতনুর আর খাওয়া হল না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, নিজের সচেতনতার বিরুদ্ধে অতনুর সমগ্র সত্তা চিৎকার করে উঠতে চাইল 'আগুন, আগুন, বাঁচাও, বাঁচাও' বলে। গলা দিয়ে স্বর বেরুল না।

মরে যাবার সময় মানুষের কেমন লাগে জানে না অতনু, কিন্তু সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, জ্বালা, বুকের ওপর শতমন পাথরের ভার, মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে ওঠা তীব্র এক অনুভূতি আর শরীর অবশ-করা প্রচণ্ড এক ভয় অতনুকে দিশেহারা করে তুলল। ভেতরের আরেক অতনু তখনও সচেতন 'তোমার কিছু হয়নি, কোথায় আগুন! ওই তো ঝড় আর বৃষ্টি মাতামাতি করছে এই গহন রাত্রির বুকে।'

কিন্তু অতনু আর পারছে না। জীবনীশক্তি বুঝি শেষ হয়ে আসছে। মনের মধ্যে ভেসে উঠছে বাবার মুখ, নমিপিসির মুখ, আর সচেতন অতনু হারিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। এই সুন্দর বৃষ্টিঝরা বর্ষার রাত, এই নীল আলোয় ভরা সাজানো গোছানো শোবার ঘর মুছে আসছে অতনুর দৃষ্টি থেকে। তার জায়গায় ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে লকলকে আগুনের শিখা। এক অদ্ভুত লালচে-হলুদ আলো গ্রাস করে নিচ্ছে সবকিছু। এত যন্ত্রণা সে আর সইতে পারছে না।

শেষ শক্তিটুকু সংগ্রহ করে অতনু গড়িয়ে-গড়িয়ে এসে পৌঁছল ঘরের ভেজানো দরজার সামনে। কোনোক্রমে চিৎকার করে উঠল, 'নমিপিসি, আগুন!' নিজের কানেই সে-চিৎকার অব্যক্ত গোঙানির মতো শোনাল। অতনুর চোখের সামনে নেমে এল কালো অন্ধকারের নিরেট দেওয়াল। শুধু জেগে রইল সারা শরীর ঝলসে যাবার জ্বালাময় অনুভূতি।

জ্ঞান হবার পর অতনুর কানে এল ডাক্তারকাকুর গলা। তখনও অতনু চোখ মেলে চায়নি। ডাক্তারকাকু বলছেন, "প্রচণ্ড কোনো মেন্টাল শকে ওর এমনি হয়েছে।" বাবার উদ্বিগ্ন গলাও শুনতে পেল অতনু, "কিন্তু মেন্টাল শক্ পাবার কোনো কারণ তো ওর নেই। ও বরাবরই একটু চুপচাপ ধরনের, তবু..."

অতনু আস্তে আস্তে ভারী চোখের পাতাদুটো আলাদা করতে পারল। বাবা বসে আছেন বিছানার একধারে, আরেক দিকে একটা চেয়ারে ডাক্তারকাকু। মাথার শিয়রে বোধহয় নমিপিসি। ব্যস্ত হয়ে ডাক্তারকাকু বললেন, "এখন কেমন বোধ করছ?"

চোখটা আবার বন্ধ করল অতনু। মাথার মধ্যে ভারী সিসে, সারা শরীরে যন্ত্রণা। ডাক্তারকাকুর গলা শুনল অতনু, "রামু, তাড়াতাড়ি এক গ্লাস গরম দুধ।"

কোনোক্রমে চোখ মেলে অতনু বলল, "আমার কী হয়েছিল?"

ডাক্তারকাকু একটু হেসে বললেন, "কিচ্ছু হয়নি তো তোমার। বিকেলবেলাই দেখবে চাঙ্গা হয়ে গেছ। শুধু দুদিন একটু রেস্ট নেবে। দেখি হাতটা, একটা ইনজেক্শন দিয়ে দিই।"

চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকল অতনু। আচ্ছন্ন ভাবটা কাটছে না কিছুতেই। শুনতে পাচ্ছে, ডাক্তারকাকু বলছেন, "আর কোনো ভয় নেই। আজ সারাদিন ও ঘুমুবে। সন্ধেবেলা আমাকে একটা খবর পাঠিয়ো। ততক্ষণে অবিশ্যি ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে।"

বাবা বললেন, "কিন্তু আমাকে যে ঘন্টা-কয়েকের জন্য বেরোতেই হবে।"

ডাক্তারকাকু বললেন, "কোনো ভয়

নেই, তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে এসো।"

ক্ষীণগলায় অতনু বলল, "তাড়াতাড়ি চলে এসো বাপি।"

"হ্যাঁ, আমি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসব।" অতনুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে শান্তনু রায়চৌধুরী বললেন।

বিকেলবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে বাইরের ঝক্‌ঝকে রোদ্দুর আর চিকন সবুজ গাছের দিকে তাকিয়ে ছিল অতনু। এখন ও বেশ সুস্থ বোধ করছে। নমিপিসি বসে আছে মাথার শিয়রে।

কাল রাত্তিরের সব কথা মনে পড়েছে অতনুর। নমিপিসি বলেছে, অতনুর বিছানা থেকে পড়ে যাবার শব্দেই বোধহয় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার। তারপর অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখে ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ঘরের ভেজানো দরজার সামনে। সেই রাত তিনটে থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত ডাক্তারকাকু ঠায় বসে ছিলেন অতনুর কাছে। ওর নাকি বাঁচবারই আশা ছিল না।

অতনু ভাবছিল, কী ঘটেছিল তার কাল রাত্তিরে? আর মনে হচ্ছিল যদি অতনুর মা থাকতেন? মাকে মনেই পড়ে না অতনুর। আজ সারাদিনই ছবিতে দেখা মায়ের মুখটা আবছা স্বপ্নে দেখেছে অতনু। যেন মা মাথায় হাত রেখে বলছেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। হয়তো আসলে নমিপিসিই হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল মাথায়। অতনু বুঝতে পারেনি। নমিপিসির কাছেই তো মানুষ হয়েছে অতনু। নমিপিসি খুব ভাল।

বাবা অবিশ্যি খুবই ভাল। নাম করা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। কত কাজ তাঁর। সময়ই পান না। তবু অতনুর সব আবদার, সব শখ মেটান, সব কথা শোনেন।

তবু ছোটবেলাটার জন্যে কেন যে মনটা টনটন করে! কেন যে মনে হয় কত কিছুই হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। আবার যখন ও একলা থাকে, মনে হয় আরও কেউ বুঝি রয়েছে ওর পাশে। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় অন্য আরেক অতনু ঘিরে রয়েছে তাকে।

হঠাৎই বড় মন কেমন করে উঠল অতনুর। আজকে সবকিছু কেন যে এমনি ফাঁকা লাগছে। নমিপিসির দিকে তাকিয়ে অতনু বলল, "বাপি আসেনি, পিসি?"

"হ্যাঁ, এসেছেন। তুমি ঘুমুচ্ছ দেখে চলে গেলেন। বোধহয় স্টাডিতে আছেন।"

"একবার ডাকবে?" বলেই অতনু বলল, "থাক, ডাকতে হবে না। আমিই যাই।"

নমিপিসি হাঁহাঁ করে উঠল, "তার চেয়ে আমি ওঁকে ডাকছি।" অতনু কথা শুনল না। বলল, "তুমি একটু ধরো, আমি ঠিক যেতে পারব।"

মাঝের একটা ঘর পেরিয়েই স্টাডি। সেটুকু আসতেই হাঁফ ধরে গেল অতনুর। মাথা ঝিমঝিম করছে। বাবা বসে আছেন লম্বা সোফাটার একধারে। অতনু পাশে এসে দাঁড়াল। মাথার ঝিমঝিম ভাবটা কেটে গেল। অবাক চোখে তাকিয়ে রইল অতনু তার বাবার দিকে।

পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন শান্তনু রায়চৌধুরী। অতনু যে এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, সেই বোধটুকুও যেন নেই। এমনি অবস্থায় তাঁকে কোনোদিন দেখেনি অতনু। অ্যাশট্রের ওপর জ্বলন্ত চুরুটটা কতক্ষণ পুড়ছে কে জানে!

আস্তে-আস্তে দুর্বল হাতটা বাবার হাতের ওপর রেখে অতনু বলল, "কী হয়েছে তোমার বাপি?"

চমকে উঠলেন শান্তনু। অতনুকে আদর করে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে। চুপচাপ কেটে গেল কতক্ষণ। অতনুর মনে হল বড় ঘড়িটার কাঁটা একটুও সরছে না।

"কী হয়েছে, বলো না বাপি?"

রাশভারী মানুষটা যেন ভেঙে পড়লেন। "একজনকে আমি হারিয়েছি বাপি!"

অতনু বুঝতে পারছে না। একটু থেমে ধরা গলায় শান্তনু বললেন, "আজই হয়তো তোকে এসব কথা বলা উচিত নয়, তবু—"

"তুমি বলো বাপি, কী হয়েছে বলো। আমি তো এখন ভাল হয়ে গেছি।"

অতনুর মাথায় ঘন চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে আদর করতে-করতে শান্তনু বললেন, "তুমি যখন খুব ছোট্ট, তোমার মা মারা যান। তখন আমার অবস্থাও ভাল ছিল না, তা ছাড়া দেখার মতোও তো কেউ ছিল না। আমার এক বন্ধু রমেশ, পাটনার নামকরা এক ডাক্তার, তিনি তোমার ভার নেন। তোমার যখন তিন-চার বছর বয়েস, তোমাকে আমি নিজের কাছে এনে রাখি। কিন্তু আরেকজন থেকে গিয়েছিল রমেশের কাছে।"

"আরেকজন, কে বাপি?"

খানিকক্ষণ অতনুর দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থেকে শান্তনু বললেন, "তোমার ভাই, তোমার যমজ ভাই সঞ্জয়।"

"আমার ভাই! যমজ ভাই! কী বলছ বাপি?", বিস্ফারিত চোখে অতনু চেয়ে রইল তার বাবার দিকে। "তাকে কেন নিয়ে আসোনি বাপি?"

"আমার যে তখন কষ্টের দিন ছিল, বাপি। তা ছাড়া ওদের তো ছেলেমেয়ে ছিল না, ওরা নিজের ছেলের মতোই মানুষ করছিল তাকে। তোমার মতোই বেড়ে উঠছিল সে। প্রতিবছর তার ছবি আমাকে পাঠাত রমেশ। হুবহু তোমার মতোই দেখতে ছিল!"

"সে কোথায় বাপি? আমি তাকে দেখব।"

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন শান্তনু। "সে আর নেই। গতকাল রাতে রমেশের বাড়ির পাশের এক গুদোমে আগুন লেগেছিল। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে রমেশের বাড়িতেও। সঞ্জয় ঘুমোচ্ছিল তার ঘরে। আগুন তাকে রেহাই দেয়নি। শেষ চিৎকারটুকু করবারও সুযোগ পায়নি সে।" গলাটা বুজে এল শান্তনুর।

অতনুর মাথার মধ্যে সব ওলোটপালোট, চোখের সামনে কুয়াশা। কালকের রাত্রিটা যেন ফিরে আসছে আবার।

"তুমি জানলে কেমন করে?" কোনোক্রমে বললে অতনু।

"সকালে কাগজে দেখেছিলাম আগুন লাগার খবর। তারপর রমেশ আমাকে ট্রাঙ্ককল করেছে। ওরা জানতে চাইছিল, আমি যাব কি না!"

অতনুর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। আজীবন অজানা, অচেনা আরেক অতনুর জন্যে কী এক শূন্যতা যেন মুহূর্তে অতনুকে নীরক্ত নির্জীব করে তুলল।

বাবার হাতটা দু' হাতে শক্ত করে চেপে ধরল অতনু। তার দু'চোখ ছাপিয়ে জলের ধারা নেমে এল।

ছবি : প্রবীর সেন

লেভেলক্রসিং

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

সকাল থেকেই আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করেছিল। একে শীতকাল তাতে আবার ঝিরঝিরে বৃষ্টি। সঙ্গে হাড়-কাঁপানো কনকনে বাতাস মিলে অবস্থা আরও ঘোরালো করে তুলেছে। নিরাপদ স্টেশনে এসে পৌঁছল প্রায় রাত নটার কাছাকাছি। অন্য দিনের মতো স্টেশনে যাত্রী আর লোকজনের তেমন ভিড় নেই। সাধারণত এ-সময় লোকের ভিড়ে চলা যায় না। আবহাওয়ার জন্যই যে এ-রকম হয়েছে নিরাপদর বুঝতে দেরি হল না। সকলেই আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেছে।

নিরাপদও হয়তো আগেই ফিরত, তবে আজ ওর ভাগ্যটা খুবই ভাল বলে ও কলকাতায় এতক্ষণ অবধি থেকে গেছে। আসলে আজ ও মস্ত একটা লাভের ব্যাপার সমাধা করতে পেরেছে, তাই এত দেরি। কলকাতায় মস্ত একটা দোকানের মালিক হল আজ থেকে নিরাপদ। বেশ শস্তাতেই দোকানটা একরকম হাতিয়ে নিয়েছে ও। কথাটা যতই ভাবছে ততই পুলকিত বোধ করছিল নিরাপদ। হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় শরীর কেঁপে উঠলেও পেট ও মনের আনন্দের তাগিদে আমলেই আনল না।

প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াতেই একটা ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় নিরাপদ কেঁপে উঠে গায়ের চাদরটা বেশ করে জড়িয়ে নিল। ট্রেন রাত নটা পঁচিশে। এখন নটা পাঁচ। গাড়ি প্ল্যাটফর্মে ঢোকেনি। রোজ এই এক যন্ত্রণা, টাইমের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

চারদিকে তাকাল নিরাপদ। নেই-নেই করেও এই শীতের রাতে স্টেশনে কম যাত্রী জমা হয়নি। শীতকে বাগে আনতে নিরাপদ এবার গুনগুন করে গান করতে শুরু করল।

একটু পরেই ট্রেন এসে গেল। নিরাপদ একটা কামরায় চট করে উঠে পড়ল। জানলার কাছে বসে ও শার্সি টেনে নামিয়ে দিল। আস্তে আস্তে কামরাতে আরও জনাকয়েক যাত্রী উঠল। সবাইকে চাদরে শরীর-মাথা ঢাকা অবস্থায় কিম্ভূতকিমাকার লাগছিল। ও বেশ আরাম করে বসে আবার নতুন দোকানটার কথাই ভাবছিল। সত্যিই ভাগ্যটা ওর চমৎকার। যা ধরছে তাই সোনা।

নটা পঁচিশের জায়গায় সাড়ে-নটায় ট্রেন ছাড়ল। যাকগে পাঁচ মিনিট দেরি কিছুই না। পৌঁছতে পৌঁছতে অবশ্য রাত সেই সাড়ে-দশটা, এই যা বিরক্তিকর।

ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ঝিমুনি এসেছিল নিরাপদর। একটা স্টেশনে ট্রেন থামতেই ওর ঘুম ভেঙে গেল।

চারদিকে তাকাল নিরাপদ। কামরাটা প্রায় খালিই বলা চলে। মাত্র জনাকয়েক যাত্রী আছে [illegible]

দৃশ্য ভাবাই যায় না।

নিরাপদর কানে এল ওর একটু তফাতে বসে তিন-চারজন যাত্রী কী-সব আলোচনা করে চলছে। নিরাপদ বুঝল ওরা দেশের হালচাল, খুন, ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এইসব নিয়েই আলোচনা করছে। গা করল না তেমন ও। ওর শুধু নজর পড়ল ওর সামনের সিটের একেবারে কোণের দিকে বসা একজন যাত্রীর উপর।

লোকটার মাথা বা মুখ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একেবারে জবুথবু হয়ে লোকটা বসে আছে। ঠাণ্ডায় বেশ কাহিল, বুঝতে অসুবিধা হয় না।

হঠাৎ এবার নিরাপদর কানে এল আলোচনারত যাত্রীদের একজন বলছে, "ক্রাইম ডাজ নট পে, বুঝলেন, অপরাধের শাস্তি পেতেই হয়।"

"হুঁ," মনে মনে হেসে উঠল নিরাপদ। "ক্রাইম ডাজ নট পে" কথার কথা। এটা সত্যি হলে দেশে আর অপরাধ করত না কেউ।

কথাটা ভেবে হাসলেও ওর মনটা কেমন খচখচ করে উঠল। 'দূর ছাই, যত আজেবাজে চিন্তা,' ভাবল নিরাপদ। 'লোকগুলো আলোচনার আর বিষয় খুঁজে পেল না! কিন্তু আমার ভয় কী? আমি তো আর কোনো অপরাধ করিনি। পুরনো সেই ঘটনাটা তো অনেকদিন আগেকার, তার কোনো সাক্ষীও নেই।'

এ-সব কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তবুও ওর মেজাজটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। ও এবার হাতের ঘড়িটা দেখল। প্রায় সাড়ে-দশটা। পরের স্টেশনটাই ওর। বাড়িতে পৌঁছলে তবেই শান্তি।

হঠাৎই আবার নিরাপদর নজর পড়ল কোণে গুঁড়ি মেরে থাকা লোকটার দিকে। ঠিক সেইভাবেই সে বসে ছিল। কোথায় যাবে কে জানে লোকটা। ঘুমিয়েই পড়ল নাকি?

ভাবতে ভাবতেই ট্রেন থামল স্টেশনে। তাড়াতাড়ি উঠে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল নিরাপদ। কোনোদিকে তাকাল না ও। তখনও টিপ-টিপ করে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। একেবারে হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরে যায় ঠাণ্ডাতে। কামরার ভিতরে অতটা বোঝা যায়নি। চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে রাস্তায় এসে নামল নিরাপদ। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। এই বিচ্ছিরি আবহাওয়ায় সাইকেল-রিক্শা পাওয়ার আশা দুরাশা, রিক্শাওয়ালারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঘরে ঢুকে লেপ মুড়ি দিয়েছে। কোনোদিকে না তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করল ও।

বেশ অন্ধকার রাস্তা। ভিজে সপসপে চটি পায়ে এগিয়ে চলল নিরাপদ। খানিক দূরে লেভেলক্রসিংটা পার হলেই হয়। তার পরেই ওর বাড়ি। কিন্তু আজ পথ যেন শেষ হতেই চায় না। তাছাড়া কেন জানে না থেকে থেকে নিরাপদর মনে ট্রেনে-শোনা সেই কথাটা ঝিলিক মেরে চলেছে—"ক্রাইম ডাজ নট পে।"

খানিকটা পথ এগোতেই নিরাপদর হঠাৎ মনে হল একজন কেউ পিছনে আসছে ওর। ও তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরে তাকাল

কিন্তু কই, কোথাও তো কেউ নেই? গাটা কেমন ছমছম করে উঠল ওর। মনে জোর আনার চেষ্টা করল নিরাপদ।

[illegible]

আবার হাঁটতে আরম্ভ করল নিরাপদ।

একটু পরে আবার সেই পায়ের আওয়াজ। নিশ্চয়ই কেউ আসছে। কোনো ডাকাত বা গুণ্ডা নাকি?

হঠাৎ কেউ ওর নাম ধরে পিছন থেকে ডেকে উঠল। "নিরাপদবাবু।"

"কে?" নিরাপদ থমকে দাঁড়াল।

"আমাকে চিনবেন না," খসখসে গলা শোনা গেল।

লোকটাকে চেনা মনে হল না সত্যি নিরাপদর। অবশ্য যেভাবে লোকটা চাদরমুড়ি দিয়েছে তাতে চেনা মুশকিল। এখনও অনেকটা পথই বাকি। একজন কথা বলার সঙ্গী থাকলে মন্দ হয় না, ভাবল নিরাপদ। ও তাই পিছনে তাকিয়ে বলল, "আজ বড্ড ঠাণ্ডা, না?"

চাদরমুড়ি দেওয়া লোকটা এগিয়ে এল। কিন্তু কথার কোনো জবাব দিল না।

"কতদূর যাবেন, বোসপাড়া নাকি?" নিরাপদ আবার প্রশ্ন করল।

"না, আর একটু আগে," জবাব দিল লোকটা।

"যাই বলুন এমন শীত অনেকদিন পড়েনি। আগুনে হাত-পা না সেঁকলে কোনো কাজ করতে পারব না।"

লোকটা এ-কথার কোনো জবাব না দিয়ে যা বলল তাতে নিরাপদর বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। "ক্রাইম ডাজ নট পে।"

"কী বললেন?" নিরাপদর মুখ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল।

"একটা গল্প শুনবেন?" লোকটা বলে উঠল।

গল্প! আশ্চর্য কাণ্ড! এমন সময় কেউ গল্প শোনাতে চায়? পাগল নাকি লোকটা? কথাগুলো চকিতেই খেলে গেল নিরাপদর মনে।

"এখনও তো বাড়ি ফেরার দেরি আছে নিরাপদবাবু," লোকটা প্রায় নিরাপদর কাছে এসে বলতেই গা শিরশির করে উঠল নিরাপদর। "একটা গল্প শুনতে শুনতেই বাড়ি পৌঁছে যাবেন। একেবারে সত্যিকারের গল্প।"

"আমার গল্প শোনার ইচ্ছে নেই," নিরাপদ বেশ কড়া গলাতেই বলল।

লোকটা ওর কথা আমলে না এনেই বলতে শুরু করল, "সে-ও এইরকম বৃষ্টিভরা শীতের এক রাত। টিপ-টিপ করে জল ঝরছে তো ঝরছেই। দুই বন্ধু ট্রেন থেকে নেমে রাস্তা দিয়ে চলেছিল। অন্ধকার রাত···ঠিক আজকেরই মতো। ওদেরও পার হওয়ার কথা একটা লেভেলক্রসিং— ।" একটু থামল লোকটা।

'আচ্ছা ছিনে জোঁক তো লোকটা' ভাবল নিরাপদ। নির্ঘাত পাগল!

লোকটা আবার বলতে শুরু করল, "এরকম রাত তো সহজে আসে না, কত বছর পরে এসেছে বলেই এই গল্প। তারপর শুনুন, লেভেলক্রসিংটা এখনও যেরকম দূরে দেখছেন, সেদিনও এইরকম দূরেই ছিল।" লোকটা যেন সামনের দিকে তাকাল

নিরাপদ কেমন অসুস্থ বোধ করতে লাগল। শীতটা যেন ওকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলতে চাইছে। সোয়েটার আর চাদরেও শীত মানছে না, হাড়ের ভিতরটাও কেমন কেঁপে উঠছে। সঙ্গে ওর ট্রেনে-শোনা সেই কথাটা ঘুরে-ফিরে ঝিলিক মেরে উঠছে—ক্রাইম ডাজ নট পে।

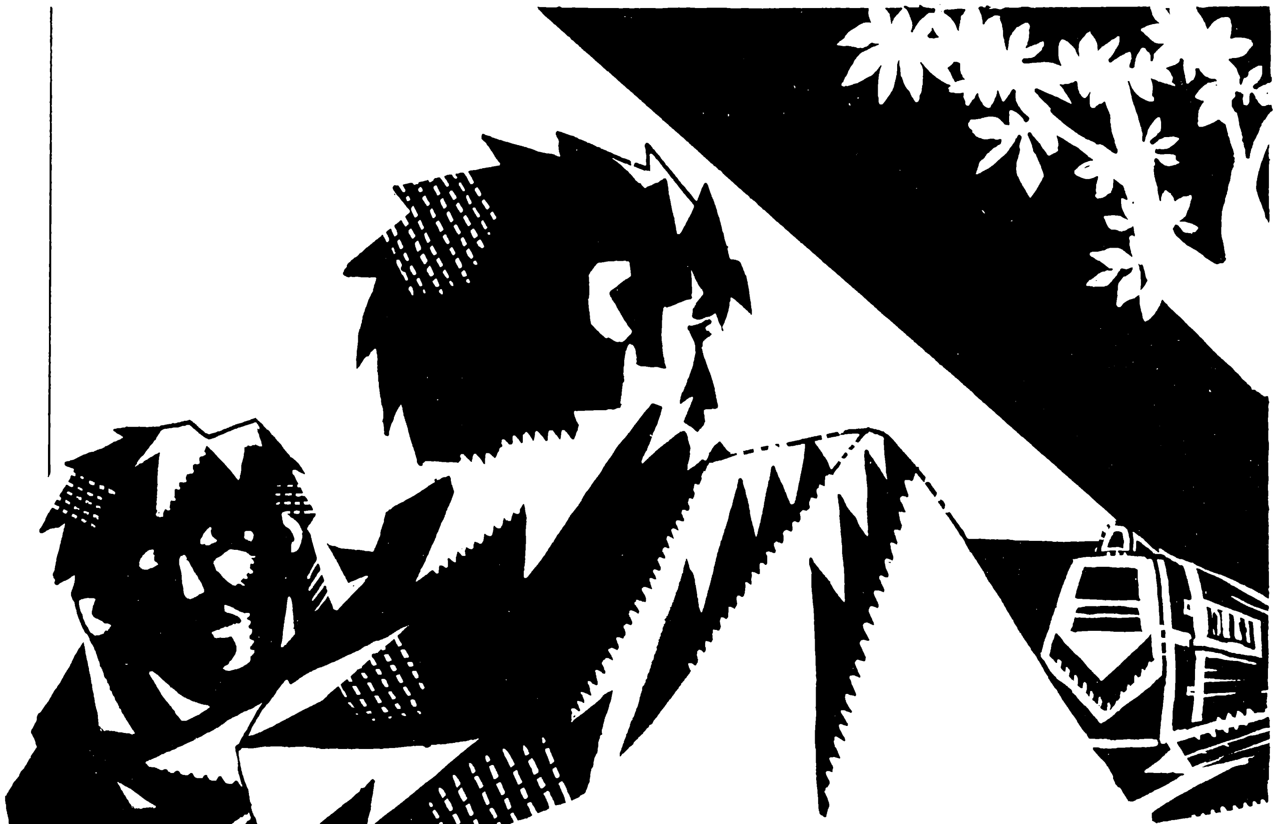

লোকটার গলা শুনে আবার সংবিৎ ফিরে এল নিরাপদর। দূরে এক্সপ্রেস ট্রেনের আলোটা ওর চোখে পড়ল।

"সে-রাতেও দূরের এক্সপ্রেস ট্রেনের আলোটা এমনি করেই দেখা গিয়েছিল," লোকটা আবার খসখসে গলায় বলতে শুরু করল। "এক্সপ্রেস ট্রেনটা এগিয়ে আসার ফাঁকে দুই বন্ধু এগিয়ে চলেছিল লেভেলক্রসিংয়ের দিকে। ঠিক আজকের মতোই।"

ততক্ষণে লেভেলক্রসিংটা দেখতে পেয়েছিল নিরাপদও। একেবারে খোলা লেভেলক্রসিং। কেউ কোথাও নেই—এমন বাদলায় দায়িত্বে থাকা লোকটা বোধহয় ঘরের মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে।

এক্সপ্রেস ট্রেনটা এগিয়ে আসছিল। রেলের লাইনে ঝমঝম শব্দ জেগে উঠেছে। ইঞ্জিনের জোরালো আলো একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

"সেদিনও ট্রেনটা এমনি করেই কাছে এসে পড়েছিল," লোকটার গলা যেন বহু দূর থেকেই ভেসে আসছে—মনে হল নিরাপদর। অথচ সে তো পাশেই দাঁড়িয়ে ওর।

হঠাৎ কী মনে হল নিরাপদর। ও স্থান-কাল-পাত্র ভুলে পালাতে গেল। ততক্ষণে এক্সপ্রেস ট্রেনটা বিরাট একটা দানবের মতোই প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে এসে পড়েছে। ট্রেনের ইঞ্জিনের আলোয় ট্রেনের লাইন পরিষ্কার চোখে পড়ছে।

"পালাবেন কোথায়, নিরাপদবাবু? গল্পের শেষটা শুনবেন না?" লোকটা বলে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদর শরীরের সমস্ত শক্তি কোথায় মিলিয়ে গেল। ও স্থাণুর মতোই দাঁড়িয়ে পড়ল। ও যেন মনশ্চক্ষে ওরই জীবনে বহু আগে ঘটে-যাওয়া একটা দৃশ্যের অভিনয় দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু এই লোকটা এ-কাহিনী জানল কেমন করে?

আচমকা বুক ফেটে কাঁদতে ইচ্ছে করল নিরাপদর। ওর মাথার মধ্যে একটা কথাই কেবল ঝড় তুলে চলল—ক্রাইম ডাজ নট পে।

ভয়ঙ্কর জোরালো শোনাল এবার লোকটার গলা, "এক্সপ্রেস ট্রেনটা কাছে এসে পড়তেই এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে ধাক্কা মেরে ট্রেনের গায়ে ছিটকে দিল···ঠিক এমনি করে— !"

নিরাপদ আতঙ্কে হিম হয়ে লক্ষ করল ওর সঙ্গী সেই লোকটা হঠাৎ কেমন বিরাট একটা কালো বাদুড়ের মতো আকার নিয়ে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দিল··· ।

পরদিন রেলের একজন কর্মচারী লাইনের পাশে আবিষ্কার করল নিরাপদর রক্তাক্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে-যাওয়া দেহটা।

ছবি : দেবাশিস দেব

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর তার দিদি ইরানি বর্ধমানের এক গ্রামে এসেছে তাদের জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজে। জ্যাঠামশাই রিটায়ার করে এই গ্রামে এসে নানারকম ফলের বাগান করেছিলেন। কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জ্যাঠামশাই মাঝরাতে কীজন্য যেন লেবুবাগানে এসেছিলেন, তারপর থেকেই তিনি উধাও। দিপু আর ইরানি এসে দেখল, লেবুবাগানের কয়েকটা গাছ কে যেন উপড়ে ফেলেছে। লেবুবাগানটা বেশ বড়, ভেতরটা অন্ধকার। তার মধ্যে ঢুকে দেখা গেল, মুরশেদ নামে একজন পাগল শুয়ে আছে। তার কাছ থেকেও জ্যাঠামশাইয়ের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। এখানে যে রান্না করে, সেই এককড়ি নামের লোকটিও কেমন যেন উল্টোপাল্টা কথা বলে। থানার দারোগা সন্দেহ করেন তাঁকে। এককড়ির সঙ্গে নিরালায় কথা বলতে এসেছে দিপু, তারপর...

ঝমঝম করে শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। সত্যি, একটু আগে আকাশে তারা দেখা যাচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্যে বজ্রপাতও হচ্ছে ঘনঘন। রান্নাঘরের মধ্যে দিপু এককড়ির গা ঘেঁষে বসে রইল। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার মধ্যে বিদ্যুতের চমক আর বৃষ্টির শব্দ। কীরকম যেন গা-ছমছম করে। অথচ দিপু তো এমনিতে তেমন ভিতু নয়। ভয় পাচ্ছে বলে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে দিপুর।

এককড়ি উঠে গিয়ে জানলার পাশে দাঁড়াল। বাইরের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে দিপুকে জিজ্ঞেস করল, "এই রকম অসময়ে ঘন ঘোর বৃষ্টি হয় কেন বলতে পারো ?"

দিপু এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন আগে কখনও শোনেনি, এর উত্তরও জানে না।

এককড়ি বলল, "ওরা চায় না এই সময় কেউ বাইরে বেরোক। এই সময় ওদের রাজত্ব চলে।"

দিপু বলল, "ওরা মানে ? কারা ?"

এককড়ি চোখ টিপে বলল, "সে তোমার না জানাই ভাল। ওদের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। যেমন আমাদের মুরশেদ-মাস্টারের অবস্থা হয়েছে।"

দিপু হেসে ফেলল। এককড়ি তাকে ভূতের ভয় দেখাতে চাইছে নাকি ? ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ভূত বেরোয়, এরকম তো কোথাও লেখা নেই।

এককড়ি আবার বলল, "ঝড়বৃষ্টিতে কাদের বেশি সুবিধে হয় জানো ? গাছগুলোর। তখন গাছগুলো ওদের সঙ্গে কথা বলে !"

দিপুর মনে হল, সত্যিই তা হলে পাগল। কথাবার্তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। কিংবা ইচ্ছে করে এরকম পাগল সাজছে এককড়ি

দিপু নিছক কথা চালাবার জন্যই বলল, "আচ্ছা এককড়িদাদা, তুমি তো গাছের ভাষা জানো ..."

"আগে জানতুম, এখন ভুলে গেছি।"

"আগে তো কথা বলতে। তুমি গাছকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা কীভাবে উত্তর দেয় ? গাছ কি শব্দ করতে পারে ?

"অদ্ভুত তোমার কথা ! মানুষ বুঝি শব্দ না করে উত্তর দিতে পারে না ? তুমি যে ইস্কুলে একজামিনের সময় প্রশ্নের উত্তর দাও, তখন কি তুমি শব্দ করো, না কাগজ-কলমে লেখো ? গাছও তেমনি হাওয়ার ওপর ডালপালা দিয়ে লেখে। সেই সব দেখেশুনে বুঝে নিতে হয়।"

"আমার মনে হচ্ছে, ঐ লেবুবাগানটার মধ্যে কিছু একটা ব্যাপার আছে। ওখানেই সব কিছু ঘটছে।"

"ঠিক ধরেছ। ঐ লেবুগাছগুলোই যত নষ্টের গোড়া। এমন নচ্ছার লেবুর জাত আমি বাপের জন্মে দেখিনি। ওরাই তো বড়বাবুকে রোজ উত্ত্যক্ত করে মারত।"

"কী বলছ তুমি ?"

"ঠিকই বলছি ! এসব আমার নিজের চোখে দেখা কিনা ! তবে তোমাকে যা বলছি বলছি, থানার দারোগাকে আমি কিছুই বলব না। সে আমাকে মারুক, ধরুক, যাই-ই করুক।"

"কয়েকটা লেবুগাছ ওখানে উপড়ে ফেলল কে, তাও জানো ?"

এবারে একগাল হেসে এককড়ি বলল, "তা আর জানব না। হেহেহে ! আমি নিজেই যে ব্যাটাদের শাস্তি দিয়েছি !"

"তুমি ? মানে, তুমি অত ভাল-ভাল গাছ..."

"মোটেই ভাল নয়। ওরা বজ্জাত। মানুষের মধ্যে যেমন হয়, তেমনি গাছের মধ্যেও কোনো-কোনোটা খুব পাজি থাকে। বড়বাবুও সে-কথা জানতেন। তুমি একটা জিনিস দেখতে চাও, তোমার সাহস আছে ?"

"হ্যাঁ, বলো, কী দেখাবে ?"

"বৃষ্টি ভিজতে পারবে ?"

"খুব জোর বৃষ্টি পড়ছে যে ?"

"এই তো ! পারবে না জানতুম। এই বৃষ্টির মধ্যে বেরুতে আমি ভয় পাই না। আমি আধপাগলা তো, তাই আমার পুরো পাগল হয়ে যাবার ভয় নেই ! থাক বাবা, তোমার গিয়ে কাজ নেই।"

"কোথায় যেতে হবে ?"

"ঐ লেবুবাগানে !"

"চলো তা হলে।"

"তা হলে এক কাজ করো। আমার টর্চটা দিচ্ছি, ওটা তুমি হাতে নাও। আর এই আলুর বস্তাটা মাথায় দিয়ে নাও, তাতে কম ভিজবে।"

সেই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল দুজনে। দিপুর খালি একটাই চিন্তা, মাথায় না বাজ পড়ে। মাথায় বাজ পড়লে নাকি মানুষ একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঐ পেয়ারাগাছগুলোরই তো কী অবস্থা হয়েছে !

এককড়ি বলল, "শোনো, আমি যখন বলব, তখনই শুধু টর্চ জ্বালবে, তার আগে নয়।"

ওরা এসে দাঁড়াল লেবুবাগানের ধারে।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে যেন বিঁধে যাচ্ছে। এককড়ি দিপুর হাত টিপে ফিস্‌ফিস করে বলল, "শোনো, শব্দ কোরো না, কেউ যেন টের না পায় আমরা এখানে আছি।"

সেইরকমভাবে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। মাথায় আলুর বস্তা দিয়েও বিশেষ কিছু সুবিধে হয়নি, দিপু একেবারে জবজবে ভিজে গেছে।

দিপু ভাবল, এখানে কিছুই ঘটবে না। শুধু-শুধু একটা পাগলের পাল্লায় পড়ে সে এখানে বৃষ্টিতে ভিজছে। দিদি নিশ্চয়ই এতক্ষণ খোঁজ করছে তার।

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটা অতিকায় সাপের মতন বিদ্যুৎ খেলে গেল। নীল রঙের আলোয় যেন চোখ ঝলসে যায়।

সেই এক পলকের আলোতেই দিপু দেখল একটা অদ্ভুত দৃশ্য। অতগুলো লেবুগাছের মধ্যে মাত্র তিন-চারটে লেবুগাছ দারুণভাবে নড়ছে। ঠিক যেন সব ডাল-পাতা কাঁপিয়ে শুরু করেছে একটা নাচ। অবিকল মানুষের মতন। বাকি সব গাছ একেবারে শান্ত।

পরের মুহূর্তেই আবার অন্ধকার।

এককড়ি বলে উঠল, "জ্বালো! এবারে জ্বালো!"

দিপু শুনতে পেল না। তার চোখে ঘোর লেগে গেছে।

এককড়ি তাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "কী হল? টর্চ জ্বালো! শিগগির জ্বালো!"

দিপু বলল, "অ্যাঁ? কী বলছ?"

ওর হাত থেকে টর্চ কেড়ে নিয়ে নিজেই জ্বালল এককড়ি।

এবারে কিছুই দেখা গেল না। সব স্বাভাবিক। ওদেরই মতন সব ক'টা লেবুগাছ শান্তভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভিজছে। কয়েক মুহূর্ত আগে ওদের মধ্যে তিন-চারটি যে প্রবলভাবে নাচ শুরু করেছিল, তার কোনো চিহ্নই নেই।

এককড়ি বলল, "যাঃ, এখন আর কিছু নেই। যখন দেখবার, তখন তো দেখতে পেলে না!"

দিপু এখনও চুপ করে রয়েছে। কোনো কথা বলতে পারছে না। যা দেখল একটু আগে, তার মানে কী? গাছগুলো কেন ওই রকম করছিল? কেনই বা থেমে গেল?

এককড়ি বলল, "চলো, আর কিছু দেখা যাবে না। ভালই হয়েছে, দেখলে তুমি তখন কী করে বসতে!"

দিপুর মনে হল, বাতাসে বোধহয় নানারকম পর্দা আছে। এক-এক সময় তার এক-একটা পর্দা সরে যায়, অমনি অন্যরকম কিছু একটা বেরিয়ে পড়ে।

আবার কি বিদ্যুৎ চমকাবে না? আবার কিছু দেখা যাবে না?

এ-কথা ভাবতে-ভাবতেই আর-একবার বিদ্যুতের আলোয় চিরে গেল আকাশ। কিন্তু এবারে কিছুই দেখা গেল না। অন্ধকারেও যে-রকম, আলোতেও গাছগুলো সেই একই।

তবু দিপুর জেদ চেপে গেছে।

সে বলল, "এককড়িদা, তুমি ফিরে যাও, আমি আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকব।"

এককড়ি বলল, "তা হয় না, বাছা! তোমাকে কি আমি একা ফেলে যেতে পারি? এসব বড় বিপদের জিনিস।"

"এককড়িদা, তুমি কী দেখার কথা বলছিলে? ঐ যে তিন-চারটে গাছ আলাদাভাবে নাচছিল, সেই কথা?"

"তুমি সেটা দেখেছ? ঐ গাছগুলো যাদের সঙ্গে কথা বলছিল, তাদের দেখতে পাওনি?"

"কাদের সঙ্গে কথা বলছিল?"

"তারাই তো আসল! তারা চট করে দেখা দেয় না। অনেক সাধ্যসাধনা করতে হয়।"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আর বোঝার দরকার নেই। চলো তো!"

দূর থেকে ইরানির ডাক শোনা যাচ্ছে, "দিপু! এই দিপু!"

সে-ডাক যেন কত দূরে। দিপুর ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

যেমন হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ আবার থেমে গেল। আকাশ একেবারে পরিষ্কার।

যে তিন-চারটে গাছ অস্বাভাবিক ব্যবহার করেছিল, দিপু তাদের চিনে রেখেছে। সেদিক থেকে একবারও চোখ সরায়নি।

এবার তার মাথায় একটা ঝোঁক চেপে গেল। সে দৌড়ে লেবুবাগানের মধ্যে ঢুকে তারই একটা গাছকে ধরে পরীক্ষা করতে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে দিপু ছিটকে পড়ল মাটিতে। (ক্রমশ)

ছবি : অনূপ রায়

'পাঠভবন'-এর প্রধানা শিক্ষিকা কী বলেন

বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে কয়েকশো গজ হেঁটে গেলেই দক্ষিণ কলকাতার সুপরিচিত স্কুল পাঠভবন বয়স যদিও বেশি নয়, তবু স্কুলটির সুনাম প্রচুর স্কুলের মূল এলাকাটি বিশেষ বড় নয়। তবে কিঞ্চিৎ স্থানাভাব থাকলেও শৃঙ্খলার অভাব নেই।

১৯৬৫ সালে স্কুলটির প্রতিষ্ঠা। এখান থেকে প্রতিবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় গড়ে ১০০ জন ছাত্রছাত্রী। তার মধ্যে গড়ে শতকরা ৫০ জন প্রথম বিভাগে, এবং বাদবাকিরা দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে। প্রতিবছরই বারো থেকে পনরোটি স্টার থাকে।

বর্তমান প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী ভামতী সেনগুপ্ত স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন। তাঁর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সাতাশ বছরের। শ্রীমতী সেনগুপ্তের নিজের বিষয় ইংরেজি

"পরীক্ষায় ভাল ফল করতে হলে কীভাবে তৈরি হতে হবে," এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী সেনগুপ্ত বললেন, "প্রথমেই ছোটবেলা থেকে পড়ার একটা নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। এই অভ্যাস থেকেই ক্রমশ পড়াশোনার প্রতি একটা টান গড়ে ওঠে। নিজের ওপর আস্থা আসে প্রতিটি বিষয় খুব খুঁটিয়ে পড়তে হবে। সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত দু'ধরনের প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্যই তৈরি থাকতে হবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরই লিখে লিখে অভ্যাস করা উচিত। ক্লাসে যা পড়া হচ্ছে, সেটা মাথায় রাখা চাই। স্কুল কামাই করা একেবারেই চলবে না পড়া কখনো বাকি ফেলে রাখা ঠিক নয়। অন্তত

> **"ভূগোলে প্রতিটি উত্তরের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ম্যাপ দিতে পারলে নম্বর বেশি উঠবে। ইতিহাসেও ঐতিহাসিক মানচিত্রসহ উত্তর লিখতে পারলে খুবই ভাল।"**

প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন তৈরি করা চাই। পরীক্ষার খাতায় অতিরিক্ত লেখার অভ্যাস ঠিক নয় তাতে অনেক সময় জানা প্রশ্নও ছেড়ে আসতে হয় বানানের শুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হবে। ক্লাসের খাতা সংশোধন করে দেওয়ার পর ভুল সংশোধনের অভ্যাস করতে হবে। তাছাড়া যত বেশি সংখ্যক টেস্ট পেপার সমাধান করা যায়, ততই লেখার মান বাড়বে। ভাল উত্তরের প্রথম শর্তই হল: উত্তর হবে সঙ্গতিপূর্ণ ও যথাযথ।"

ইংরেজি ও বাংলা পড়া সম্পর্কে তিনি জানালেন, "ভাষার উপরে সত্যিকারের দখল আনতে হলে শুধুমাত্র কয়েকটি পাঠ্যবইয়ের মধ্যে নিজেকে আটকে না-রেখে নানা ধরনের বই পড়া উচিত। নিজের বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারার জন্যে ভাষার কম্পোজিশান অংশের উপর যথেষ্ট জোর দিতে হবে।"

অঙ্ক সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল: "ছোটবেলা থেকেই অঙ্কে ভীতি কাটানোর চেষ্টা করা উচিত। এইজন্যেই উপযুক্ত শিক্ষকের কছে অঙ্ক শিখতে হবে। না-বুঝে প্রায় মুখস্থ করার মতো অঙ্ক অভ্যাস করলে অঙ্কের ভয় আরও বাড়ে। অঙ্কের প্রাথমিক জ্ঞানটা খুব পোক্ত হওয়া প্রয়োজন।"

অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে শ্রীমতী সেনগুপ্তর অভিমত হল: "যান্ত্রিকভাবে বিজ্ঞান মুখস্থ না করে প্রথম থেকেই বুঝে পড়া উচিত। বুঝে পড়লে অনেক কঠিন বিষয়ও অপেক্ষাকৃত সহজে আয়ত্ত হয়। উত্তরের সঙ্গে যতটুকু সম্ভব ছবি স্কেচ করে বোঝাতে হবে। জীবনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছবি আঁকা অপরিহার্য। নিপুণ না হলেও প্রতিটি ছবি পরিচ্ছন্ন এবং বোধগম্য হওয়া চাই। ভূগোলে প্রতিটি উত্তরের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ম্যাপ দিতে পারলে নম্বর বেশি উঠবে। ইতিহাসেও ঐতিহাসিক মানচিত্রসহ উত্তর লিখতে পারলে খুবই ভাল।

"কর্মশিক্ষায় হাতের কাজ যতটা সম্ভব নিখুঁত করা চাই। তার জন্যে চাই ধৈর্য এবং মনঃসংযোগ। কর্মশিক্ষার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একটা ধারাবাহিক নোট রাখতে হবে।"

তাঁর মতে, "আনন্দমেলা স্কুল-পড়ুয়াদের পক্ষে একটি সুন্দর পত্রিকা।"

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়

পাঠভবনে এবার ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়ে উঠেছে যথাক্রমে রাজীব ঘোষ, পারমিতা চক্রবর্তী ও অনিন্দ্য সিংহ। তাদের তিনজনের বিশেষ করে পারমিতা ও অনিন্দ্যর মধ্যে, নম্বরের ফারাক খুব কম। রাজীব পেয়েছে শতকরা ৮৫·৫ নম্বর, পারমিতা পেয়েছে শতকরা ৮১ নম্বর এবং অনিন্দ্যর সংগ্রহ শতকরা ৮০·৩ নম্বর।

রাজীব ক্লাস ওয়ান থেকেই পাঠভবনে পড়ছে। পারমিতা পড়ছে ক্লাস টু থেকে, আর অনিন্দ্য ক্লাস ফোর থেকে। তারা তিনজনেই গড়ে দৈনিক ঘন্টা-ছয়েক পড়ে।

তারা তিনজনেই বাংলা ব্যাকরণ অংশের জন্য পড়ে নির্মলকুমার দাস ও শশাঙ্কশেখর সিংহের 'প্রবেশিকা বাংলা ব্যাকরণ'। ইংরেজিতে পি. কে. দে-সরকার। অঙ্কের জন্য কে. সি. নাগ ও কে. পি. বসু। ভূগোল পড়ে অমরনাথ সেনগুপ্ত ও তরুণবিকাশ লাহিড়ীর বই। ভৌতবিজ্ঞানে রেফারেন্স হিসেবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বইটা খুব কাজে লাগে।

ভবিষ্যতে কোন্ বিষয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে, এই প্রশ্নের জবাবে রাজীব এবং অনিন্দ্য জানিয়েছে, তারা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়তে চায়। তবে পারমিতা আর্টস পড়বে—ইতিহাস কিংবা ইংরেজি।

পাক্ষিক আনন্দমেলা তারা তিনজনেই নিয়মিত পড়ে।

অপরাজিতা

তিন রকম

অমলকান্তি ঘোষ

হুকুম

অফিসের ম্যানেজার, ভুলে গেছি কী-যে নাম,
হঠাৎ পেলেন এক জরুরি টেলিগ্রাম।
হুকুম ওপর থেকে—
"চলে যাও গাড়ি হেঁকে,
খোলা মাঠে গিয়ে করো রোদ্দুরে ডান-বাম

ডিনার

সেদিন ঘটল এক কেলেঙ্কারি,
ছাগল টেবিলে বসে খেলেন 'কারি'
বললেন দাড়ি নেড়ে
"রান্না হয়েছে বেড়ে
তারপর ছুটে চলে গেলেন [illegible]

ওষুধ

ন্যাপকিন, ছুরি-কাঁটা, কিছুতেই নেই ভুল।
ডিনারের মেনু হল ট্যাবলেট-ক্যাপসুল।
ঘুমোবার আগে ভাই
ওষুধ হিসেবে খাই
এক ঢোক জলসহ দুই কণা তণ্ডুল।

ছবি : অহিভূষণ মালিক

টিনটিন

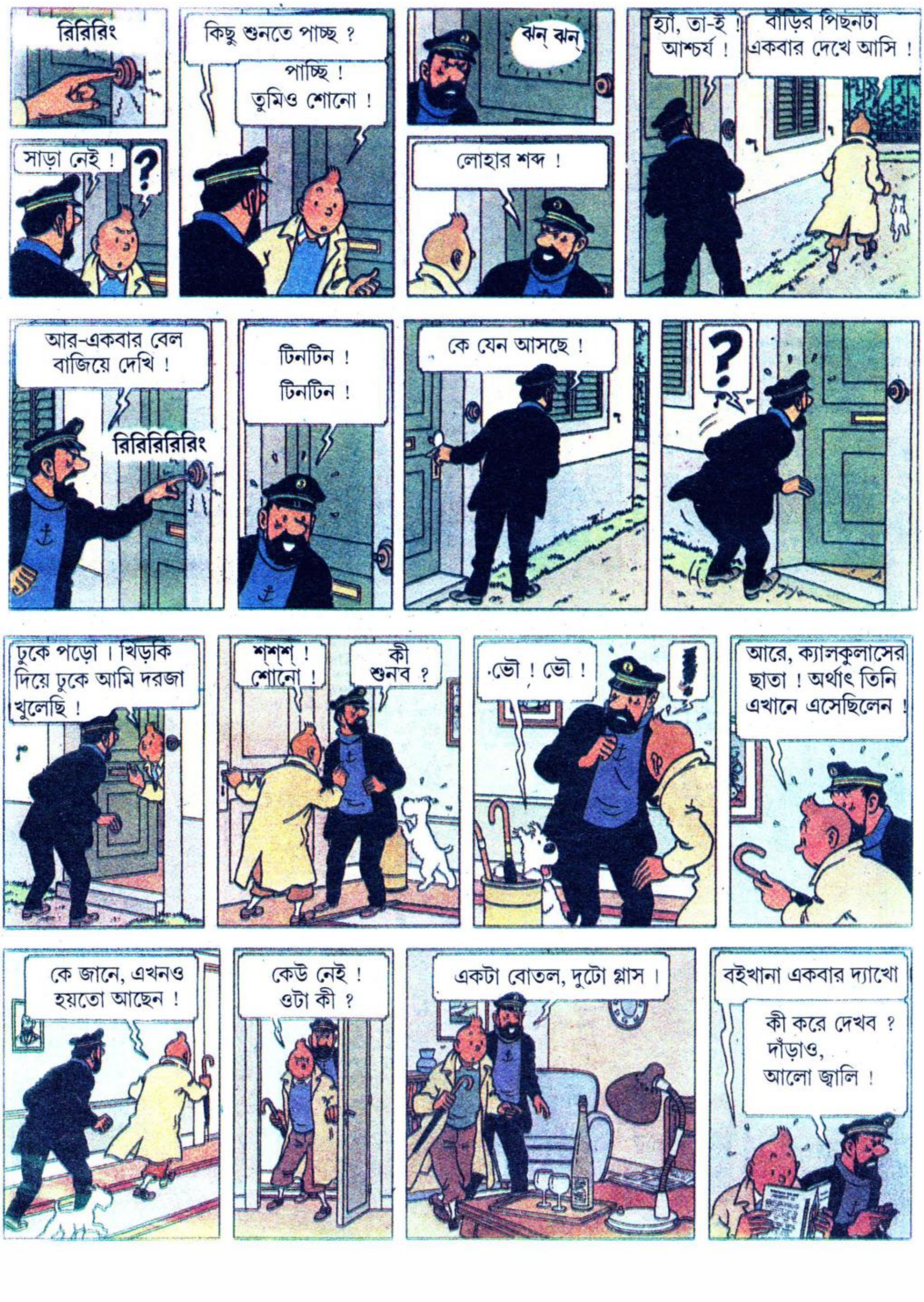

রিরিরিং
সাড়া নেই !
?
কিছু শুনতে পাচ্ছ ?
পাচ্ছি ! তুমিও শোনো !
ঝন্ ঝন্
লোহার শব্দ !
হ্যাঁ, তা-ই ! আশ্চর্য !
বাড়ির পিছনটা একবার দেখে আসি !
আর-একবার বেল বাজিয়ে দেখি !
রিরিরিরিরিং
টিনটিন ! টিনটিন !
কে যেন আসছে !
?
ঢুকে পড়ো । খিড়কি দিয়ে ঢুকে আমি দরজা খুলেছি !
শ্‌শ্‌শ্ ! শোনো !
কী শুনব ?
ভৌ ! ভৌ !
আরে, ক্যালকুলাসের ছাতা ! অর্থাৎ তিনি এখানে এসেছিলেন !
কে জানে, এখনও হয়তো আছেন !
কেউ নেই ! ওটা কী ?
একটা বোতল, দুটো গ্লাস ।
বইখানা একবার দ্যাখো
কী করে দেখব ? দাঁড়াও, আলো জ্বালি !

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

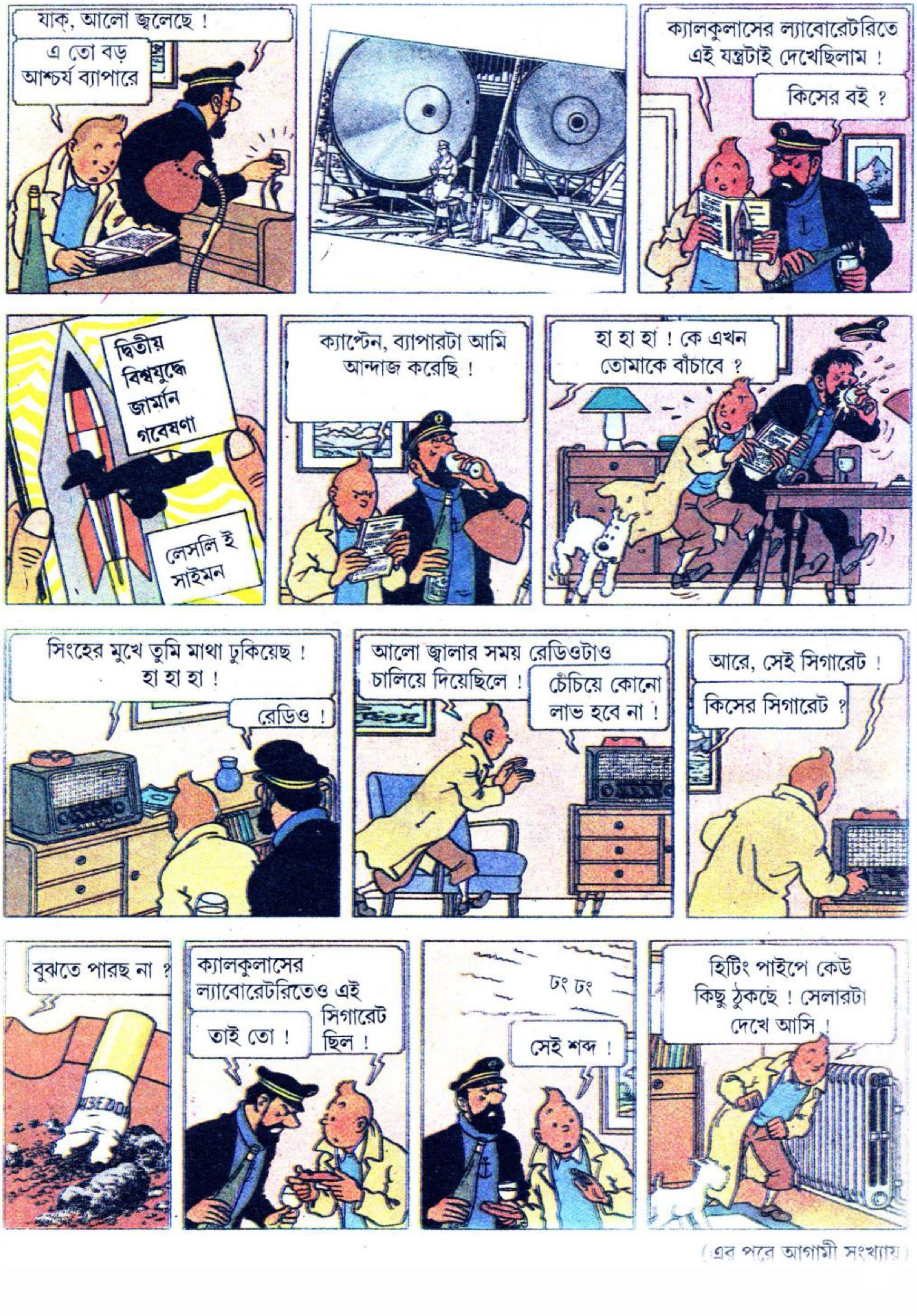

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
রোভার্সের বিস্তর খেলোয়াড় অসুস্থ। বেশ-কিছু জুনিয়ারকে নিয়ে তাই আইসল্যাণ্ডে যেতে হচ্ছে। এখন অসুস্থ বোধ করছে রয়ও ...
উঃ, মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে !
বিশ্রাম নাও । টেম্পারেচার দেখতে হবে
বিমানে সবাই উদ্বিগ্ন ...
রয় অসুস্থ হলে তো গেছি !
ডাক্তার বলেছিলেন, অনেকে হয়তো দেরিতে অসুস্থ হবে ।
নীচে আইসল্যাণ্ড ...
আশ্চর্য জায়গা !
শীতকালে এখানে রোদ্দুর মেলে মাত্র দু'ঘণ্টা ।
আইসল্যাণ্ডে নামার পর ...
ওই আসছে ওরা !
রিপোর্টার
জানতে চাইবে, আমরা সুস্থ কি না !
ভিড় ঠেলে খেলোয়াড়রা এগোচ্ছে ...
রয় !
কী জানতে চাও ? আমরা সুস্থ কি না ? হ্যাঁ ।
হাহা !
রয় নিজেই যে অসুস্থ. রিপোর্টাররা তা বুঝতে পারেনি ...
খুব ধোঁকা দেওয়া গেছে !
কেমন আছ এখন ?
এখনও মাথা ভার
কী হয়েছে আমার ?
বলা শক্ত !
নার্ভাস টেনশন হতে পারে !

তোমার মনের উপরে গত কয়েকদিন তো ঝড় নেহাত কম যায়নি !
পরদিন ··· হিকলাভিক স্টেডিয়ামে ···
রোভার্স নামছে ! কিন্তু রয় কোথায় ?
ওই তো !
ট্র্যাক স্যুট পরেছে ! তার মানে নামবে না !
ওর বদলে ডিকসন নামছে !
তাজ্জব ব্যাপার !
মাঠে হৈচৈ থামার পরে ···
তুমি না-নামায় ওরা খুশি !
হুম !
কিন্তু নামব কী করে ?
যাক, যারা নামছে, তারাও খারাপ নয় !
দেখা যাক !
আগের ফল ১—১
কিলান বল পেয়েছে !
ব্ল্যাকিকে দিক !
কিলান কিন্তু নিজেই মারল !
জোর বাঁচিয়েছে !
কর্নার !
হেকলাভিকের গোলরক্ষকটি চমৎকার ···
আঃ !
ডিকসনের মাথার উপর দিয়ে ক্লিয়ার করল !
অপেক্ষা করছিল ডানকান ম্যাকে ···
গোল হবেই !
সত্যি হবে কি ?
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন...
দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন।
Colgate
DENTAL CREAM
Colgate
STOPS BA
প্রতিবার দাঁত মাজার সময়
কোলগেটের নির্ভরযোগ্য
ফরমুলা আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসকে
রাখে তাজা, নির্মল···
দাঁতকে রাখে শক্ত-মজবুত,
সুস্থ-সবল।
দেখুন কি ভাবে কোলগেট কাজ করে:
দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের সৃষ্টি হয়।
কোলগেটের রাশি-রাশি ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে
এই ক্ষয় সৃষ্টিকারী খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দূর করে,
দাঁতকে পরিষ্কার, ঝকমকে রাখে।
ফলাফল: তাজা, নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস, ক্ষয় থেকে সুরক্ষা
আর সুস্থ-সবল দাঁত।
প্রতিবার খাবার পরেই কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে দাঁত মাজতে ভুলবেন না।
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূরে রাখুন ... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!
এর তাজা মিণ্টি স্বাদ... সত্যিই চমৎকার!
GKÐE B82 86 BN

ব-ফলা বিষয়ে গ-বো

"য-ফলার আচরণ দেখলে তোমরা জনগণ," হিগিনকাকু বললেন, "কিন্তু ব-ফলার আচরণও কম মজাদার নয়। শব্দের গোড়ায় ব-ফলা মানে সে ফেকলু, তাকে কেউ গেরাহ্যিই করে না। ধরো 'শ্বাস'। আমরা কী বলি—না 'শাশ্'। বানানে ঐ ব-ফলা যে রয়েছে, তাকে পাত্তাই দিই না। কিন্তু শব্দের গোড়ায় না থাকলে ব-ফলা তার শোধ তোলে। তখন সে ঘাড়ে চেপে থাকা বা লেগে থাকা ব্যঞ্জনটাকে ডবল করে দেয়! যেমন 'বিশ্বাস'। উচ্চারণ—'বিশ্-শাশ্'। 'স্বভাব' উচ্চারণে 'শভাব্', কিন্তু 'নিজস্ব' হল 'নিজশ্শো'। 'ক্বাথ' হল 'কাথ', কিন্তু 'পক্ব' হল 'পক্কো'। 'ত্বক' উচ্চারণ করি 'তক', কিন্তু 'স্বত্ব' হল 'শত্তো'। বুঝলে মহাশয়গণ?"

ভণ্টু শুনতে শুনতে প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিল, বলল, "বাবা রে, কাকু, এ কী কাণ্ড! তাহলে ব-ফলার দেখছি য-ফলারই দশা। শব্দের গোড়ায় নিরুদ্দেশ উচ্চারণে, শব্দের মাঝখানে ব্যঞ্জনকে ডবল করে দেওয়া।"

হিগিনকাকু বললেন, "গ-বো, লিখে নাও ব-ফলার ব্যাভার একটু আলাদা।"

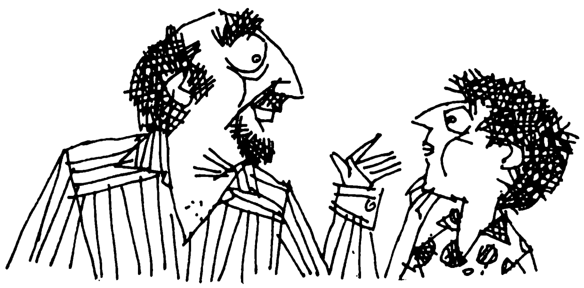

বাবা বললেন, "দাঁড়া, দাঁড়া, গ-বো কথাটার মানে কী?"

"জানো না বুঝি? কাশীতে অনেক গাধা আছে জানো তো? ওখানে ছেলেমেয়েরা যখন পরীক্ষার পড়া পড়ে তখন আশেপাশে কোনো গাধা যদি 'ঘ-ক্ক ঘ-ক্ক' করে ডেকে ওঠে তখন ছেলেমেয়েরা সেই পড়াটার পাশে লিখে দেয় গ-বো, মানে 'গধা বোলা'—গাধা ডেকেছে! তার মানে ওটা ইম্পরট্যান্ট—পরীক্ষায় আসতে পারে! দু-বার ডাকলে ভেরি ইমপরট্যান্ট! আমার কথাটাও জরুরি, তাই বললাম গ-বো!"

বাবা ভণ্টু দুজনেই হাসতে লাগল।

হিগিনকাকু বললেন, "ব্যতিক্রমটা হল, কোনো-কোনো শব্দে ব-এর উচ্চারণ রয়ে গেছে—উবে যায়নি, ব্যঞ্জনকে ডবলও করেনি। ভণ্টু, এই লিস্টিটা রাখো বাবা। উদ্বেগ উচ্চারণে 'উদ্দেগ' নয়, 'উদ্‌বেগ', এইরকম 'উদ্বোধন' হবে 'উদ্‌বোধন', 'উদ্বেল' হবে 'উদ্‌বেল', 'উদ্বাস্তু' 'উদ্‌বাস্তু', 'উদ্বর্তন' 'উদ্‌বর্তন', 'উদ্বাহ' 'উদ্‌বাহ', 'উদ্বাহু' 'উদ্‌বাহু', 'উদ্বুদ্ধ' 'উদ্‌বুদ্ধ'। বুঝেছ? সংস্কৃতে এই 'ব' বর্গীয় ব ছিল, অন্তঃস্থ ব ছিল না—কিন্তু তা জেনে কোনো লাভ নেই। কথাগুলো খেয়াল রেখো। ঐ গ-বো!"

বাচস্পতি

নিজে-নিজে যাওয়া

মাঝে-মাঝে মিলির মনে হয়, যদি ইস্কুলের বাসে না গিয়ে নিজে-নিজে ইস্কুল যেত, বেশ মজা হত। অবশ্য ইস্কুলের বাসেও কোনো-কোনো দিন মজা হয়, তবু সাধারণ বাসে নিজে-নিজে যাওয়ার অন্যরকম মজা।

Most of the girls come to school in school-buses.
Almost all Milly's friends do.
There are some who come by car.
A few, who live close by, walk to school.
Some of Milly's class-mates come by public transport.
They do so not because they like it but because it's cheaper than school transport.
The public buses are terribly crowded at school-time.
Milly doesn't think of that, but her parents do.
So they've decided Milly had better go on using the school-bus.

চম্বল অবশ্য অনেকদিন আগেই ইস্কুলের বাস ছেড়ে দিয়েছে।

At first his parents used to worry about this but now they don't.
Chambal is old enough to take care of himself, they think.
And it isn't a long journey to school for Chambal.
Many of his friends have to change buses when coming to school but Chambal doesn't.
But sometimes when Chambal is late from school, his mother does get a little anxious.
She often tells him not to take any unnecessary risks, and Chambal doesn't.
Some of his friends seem to like hanging outside buses, and Chambal did, too, at first.
But now he doesn't, any more.

এবারেও এই ক্রিয়াপদটির ব্যবহার লক্ষ করো:

To Do

Milly doesn't think of that but her parents do.
At first they used to worry about this but now they don't.
Many of his friends have to change buses but he doesn't.
She often tells him not to take risks, and he doesn't.
Some of his friends like hanging outside, and he did, too, at first.

প্রসাদ

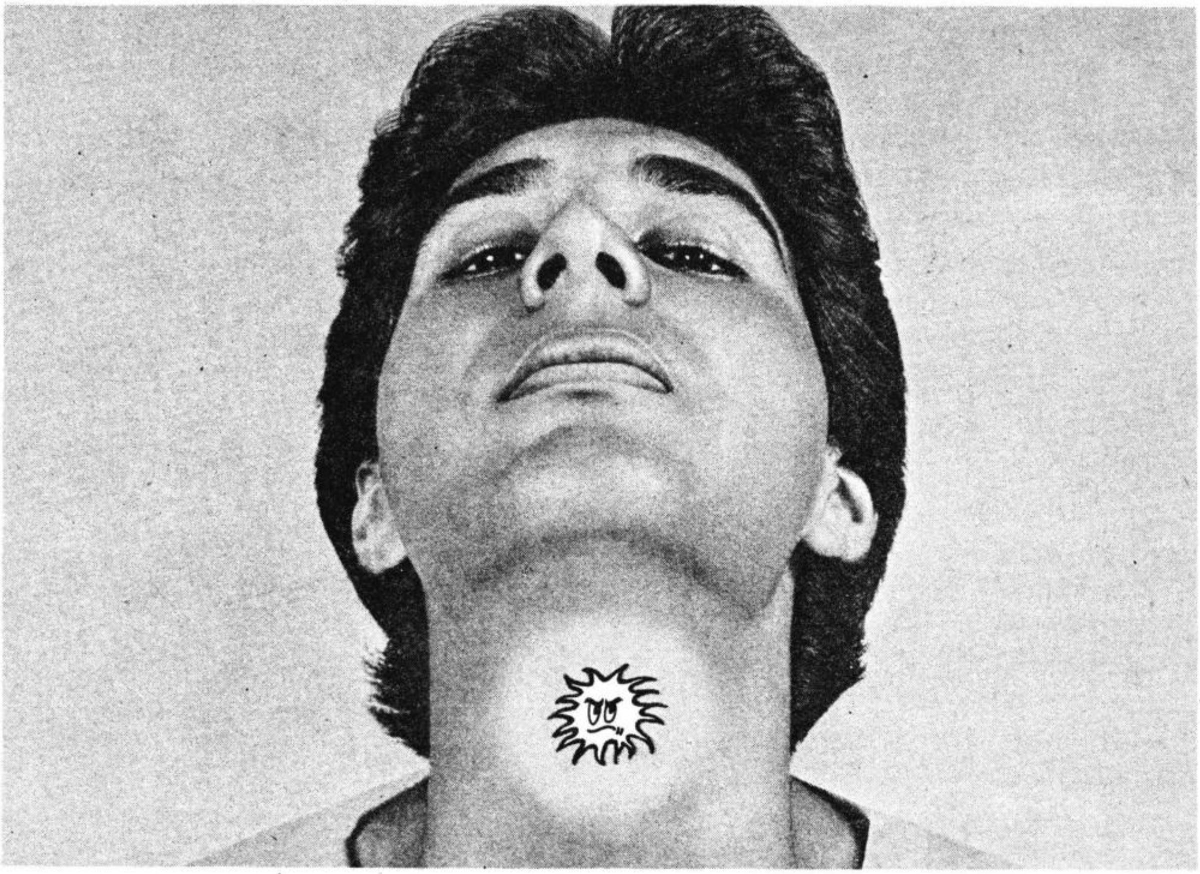

গলার 'খিচখিচ' দূর করুন...

'খিচখিচ' কি ?

যখনই আপনার গলা খুশখুশ করবে, অথবা গলা শুকিয়ে যাবে —তখনই বুঝবেন যে আপনার গলায় 'খিচখিচ' এসেছে।

ভিক্স নিয়ে নিন
'খিচখিচ' দূর করুন

ভিক্স নিয়ে নিন
ভিক্স কাশির বড়িতে গলায় আরামদায়ক ৬ টি ভিক্সের ঔষধি আছে, যা 'খিচখিচ' দূর করে।

তার জন্য যখনই গলায় খিচখিচ' আসবে, ভিক্স নিয়ে নিন।

ভিক্স নিয়ে নিন!

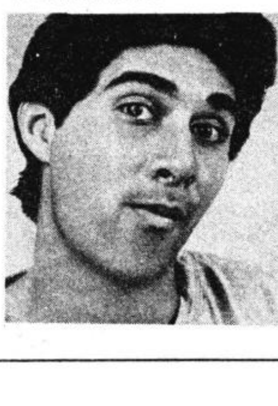

OBM/1829 BEN

দুটি ছড়া

সুভাষপ্রসন্ন ঘোষ

রিকশায় যাচ্ছিল
একদিন শ্রীনিবাস,
হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে
ফেলে দিল মিনিবাস ।
তাইতেই কুপোকাত
ছড়ে গেল হাত-টাত
মেজোমাসি বললেন,
‘তুই বাপু চিনি খাস ।’

॥২॥
বললে পিসি, ‘পানের সাথে
খিলখিল্লির জর্দা চাই ।’
খুঁজতে গিয়ে কলকাতাতে
হন্যে হল বড়দা তাই ।
তাইতে পিসি ভীষণ রেগে
বেরিয়ে ছুটে গেলেন বেগে
দূরের থেকে চেঁচিয়ে বলেন,
‘বেয়ানবাড়ি খড়দা যাই ।’

ব্যস্তবাগীশ

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

“সাতসকালে চললে কোথায়
কী কাজ এমন ভারী,”
চট্টোমশাই বলেন, “ভায়া,
কাজ আছে দরকারি ।
শ্যামবাজারের রসিকলালের
পাওনা কিছু টাকা,
মাস-পয়লায় না মেটালে
গাঁটের কড়ি ফাঁকা ।
হয়তো যাব হাতিবাগান
হরিমুদির কাছে,
কিনতে হবে মশলাপাতি,
আর যা কেনার আছে ।
দেখছ এখন ব্যস্ত হয়ে
ছুটছি তাড়াতাড়ি,
পিছন থেকে ডাকলে কেন
কাজটা খারাপ ভারী ।
বাড়ছে বেলা, গপ্পো ছেড়ে
চলি এবার তবে,
‘সন্ধেবেলায় দাবার আসর
আবার দেখা হবে ।”

ছবি : অহিভূষণ মালিক

কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি সার্ফ কেনেন!

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কারণ সার্ফ-এর ওপর খরচ হওয়া একেকটি পয়সা তার প্রভাব দেখিয়ে দেয়। সেজন্যে, যদি আপনি দিলদরিয়া হয়ে খরচ না ক'রে একটু চোখ খুলে খরচ করেন, তাহলে সার্ফ-ই কিনবেন।"

কিন্তু, সস্তার পাউডার কেনায় তো পয়সার দারুণ সাশ্রয় থাকে!

"একদম নয়, কারণ সস্তার জিনিষ আর ভাল জিনিষ কেনায় তফাৎ থাকে।
সার্ফ-এর সঙ্গে সস্তার পাউডার কি মোকাবিলা করতে পারে? মেপে-জুপে হিসেব করলে দেখবেন, সার্ফ কেনাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

সার্ফ কেনাই কেন, সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

"তাহলে শুনুন, সস্তার পাউডারের পুরো এক কিলোর থলিতে যতটা পাউডার থাকে, সার্ফ-এর শুধু ১/২ কিলোর ডিবেতে থাকে ঠিক ততটা পাউডার।"

কিন্তু তবু...

"প্রশ্নই ওঠেনা—কারণ, সবদিক দিয়ে সার্ফ-এর পাল্লাই ভারী হবে। তাছাড়া,
যে কোনো সস্তার পাউডার কি সার্ফ-এর মত কাপড়ে এমন শুভ্রতা আনতে পারে?
রঙীন কাপড়ে আনতে পারে এমন ঝলমলে চমক? শুধু সার্ফ-ই এক এমন পাউডার, যা দিয়ে ধুলে কাপড় দেখায় সদা নতুনের মত ...বারবার ধোয়ার পরও।"

আপনি ঠিকই বলেছেন...

"আর হ্যাঁ, সার্ফ আমার ত্বকেরও কোনো ক্ষতি করে না—মানে, আমার হাত থাকে একেবারে সুরক্ষিত।"

এবার বুঝলাম, সার্ফ লাভের সওদা কেন?

"সত্যি, তাইতো মাসে মাসে তুচ্ছ কয়েকটা পয়সা বাঁচানোর জন্যে সার্ফ-কে আমি কোনোমতেই ছাড়তে রাজী নই। আরে ভাই, পয়সা বাঁচানোই নয়, বুদ্ধিমানের কাজ হ'ল ভেবে-চিন্তে খরচ করা।"

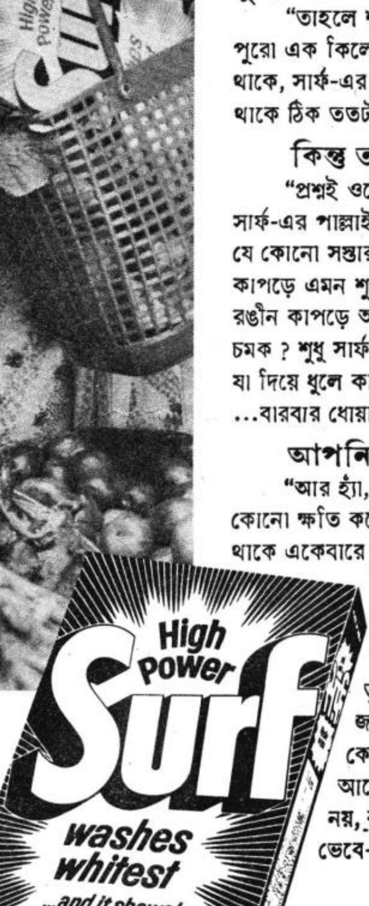

মেপে-জুপে সব যাচাই করলাম, সার্ফ-এর সওদাই সেরা মানলাম।

LINTAS SU 320 2619 BG

হিন্দুস্তান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

ধাঁধা

স্যান্ডউইচ আর পকোড়া বলল ছোট্কা, দু-প্লেট করে, আর নিজের জন্য এক কাপ কফি। আমি কফি খাব কি না জিজ্ঞাসা করেছিল ছোট্কা। কিন্তু তেতো লাগে বলে আমি আগেই না করে দিয়েছি।

ছোট্কার জন্য কফিটা যেভাবে এল, তাতে আমি একটু অবাকই হলাম। একটা পটে কালো কফি, একটা পটে চিনি, আলাদা ভাবে দুধ। ছোট্কা অবশ্য পরে বুঝিয়ে দিল। এ-রকমভাবেই নাকি বড় বড় দোকানে দেয়। দুধ-চিনি নিজের পছন্দমতো মিশিয়ে নিতে হয়।

আমাকে নিয়ে কফি হাউসে গিয়েছিল ছোট্কা শেষ দুপুরে। এরপর বাড়ি ফিরেছি। নতুন কেনা বইগুলোয় মলাট লাগিয়েছি। সন্ধেবেলার পড়াশুনার পাটও চুকিয়েছি। সব শেষ করে ছোট্কার কাছে যখন ধাঁধা চাইতে গেলাম তখন রাত বেশ ঘন। কিন্তু মজা লাগল ধাঁধাটা শুনে। কফির পেয়ালা নিয়েই ছোট্কার নতুন ধাঁধা এর মধ্যে কখন তৈরি হয়ে গেছে।

সেই ধাঁধাটাই দিচ্ছি এবার।

প্রথম ধাঁধা ॥ একটা কফির দোকানে কফি খেতে ঢুকেছেন এক ভদ্রলোক। কফির অর্ডার দিয়েছেন।

কফি এল। আলাদা পাত্রে কালো কফি। চিনি ও দুধও আলাদা-আলাদা পাত্রে। সঙ্গে কাপ, ডিশ, চামচ।

ভদ্রলোক কফিপট থেকে কাপে কালো কফির লিকার ঢেলে চিনি মিশিয়ে দিলেন। চিনিটা যাতে ভাল করে মিশে যায় সেজন্য চামচ দিয়ে সবে নাড়তে শুরু করেছেন, হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, মরা মাছির মতো কী-একটা যেন কফির কাপে ভাসছে।

ভদ্রলোক সঙ্গে-সঙ্গে বেয়ারাকে ডেকে দেখালেন। বেয়ারা এসে সেই মুহূর্তে টেবিল থেকে সবকিছু তুলে নিয়ে গেল। মিনিট কয়েক বাদে আবার নতুন করে টেবিলে আগের মতোই সবকিছু সাজিয়ে দিয়ে গেল।

ভদ্রলোক, কী মনে করে যেন, কফির পট থেকে প্রথমেই কিছুটা কফি কাপে ঢেলে চামচে করে অল্প একটু তুলে মুখে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলেন যে, দোকানদার তাঁকে ঠকিয়েছে। আগের কফির লিকারই আবার এনেছে বেয়ারা। কী করে বুঝলেন ভদ্রলোক, বলতে পারো?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কী সেই জিনিস যা মুহূর্তে একবার দেখা যায়, মিনিটে একবার দেখা যায়, মাসেও একবার দেখা যায়, কিন্তু সপ্তাহে বা বছরে একবারও দেখা যায় না?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

সনুসদুদুনা

গতবারের উত্তর ॥ (১) একটি আধুলি, একটি সিকি, একটি কুড়ি পয়সা ও দুটি দশ পয়সা। (২) UNDERGROUND। (৩) মালমসলা।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১		২	■	৩		৪
	■	৫	৬		■	
■	৭	■		■	■	
■	৮				৯	■
১০	■	■		■		■
	■	১১		১২	■	১৩
১৪			■	১৫		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) বিখ্যাত পৌরাণিক রথ। (৩) ছাতা। (৫) মহাভারতে শকুনির পরিচয়। (৮) অবনীন্দ্রনাথের লেখা বিখ্যাত বই। (১১) চায়ে মেশায় চিনি। (১৪) শালুক ফুল। (১৫) রঙ্গকৌতুক।

উপর-নীচ : (১) নক্ষত্রবিশেষ। (২) যতিচিহ্ন। (৩) প্রবঞ্চনা। (৪) বানরের প্রিয়, ফলসহ গাছটিকে চিনে নিয়ো। (৬) আরবি শব্দে বাংলা বখরা; কথাটার মানে তুমুল ঝগড়া। (৭) রাজমিস্ত্রির মাচা। (৯) পাখির বাসা। (১০) একে-দুয়ে যা, তিনে মিলেও তা—কোন্ জন্তু। (১১) কোন্ সংখ্যা মাছকে আকর্ষণ করে? (১২) নদীর বুকে থাকে, গোপন খবর রাখে। (১৩) মুণ্ডহীন দেহ।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ন	গ	দ	■	বা	র্তা	কু
হ	■	শ	কা	রি	■	ল
ব	■	■	বা	■	■	পি
ত	■	সী	ব	ন	■	মা
খা	সা	■	চি	■	গো	লা
না	না	■	নি	■	স	ই
■	ই	ক্ষু	■	চি	ল	■

মজার খেলা

এবারের খেলার জন্য চাই ষোলোটা দেশলাইকাঠি, কিংবা টুথপিক জাতীয় অন্য কোনো ধরনের ষোলোটা কাঠি। কাঠিগুলোকে টেবিলের ওপর নীচের ছবির মতন করে সাজাও। দ্যাখো, পাঁচটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

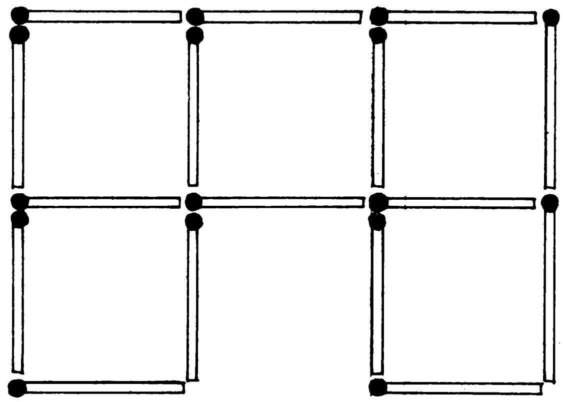

ব্যস, খেলার জন্য তুমি তৈরি।

এবার কোনো বন্ধুকে বলো, সে যেন এর মধ্য থেকে তিনটে কাঠি তুলে নিয়ে আবার এমনভাবে সাজিয়ে দেয়, যাতে কিনা টেবিলে থাকে চারটে মাত্র বর্গক্ষেত্র।

দ্যাখো, বন্ধু কী করে।

সে না পারলে যেহেতু তোমাকেই করতে হবে, তাই আগে নিজেই সমাধানটা করার চেষ্টা করো। আর সেই সমাধান মিলিয়ে নাও নীচের সমাধানের সঙ্গে।

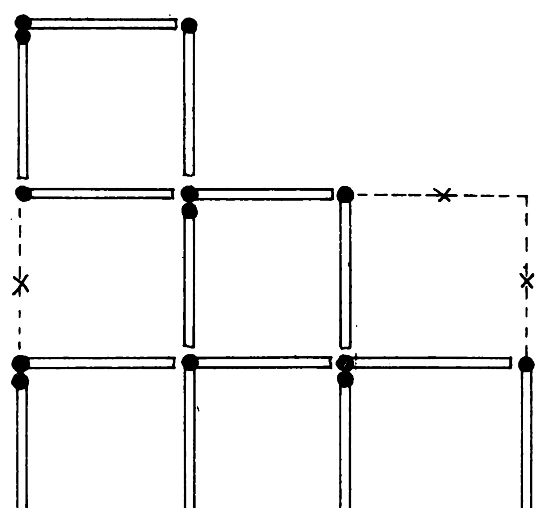

কী, মিলেছে ?

মজারু

উত্তর বটে

প্রঃ কতদিন তোমাকে বলেছি না খোকন যে সবার সামনে কানে-কানে কথা বলাটা অসভ্যতা ?
উঃ ঠিক আছে, জোরেই বলছি। তোমার পাশের ভদ্রমহিলার কানদুটো অত বড় কেন ?

প্রঃ শুধু অফিসে কথা বলার জন্যে তোমার চাকরি গেল ?
উঃ হ্যাঁ, শুধু কথা বলার জন্যে, তাও ঘুমের মধ্যে।

প্রঃ খুব গরমের সময় মুরগিরা কি ডিম পাড়ে ?
উঃ পাড়ে, তবে ডিমগুলো একটু বেশি সেদ্ধ হয়।

প্রঃ ট্যাক্সির ব্রেক ফেল করেছে স্যার, গাড়ি তো থামাতেই পারছি না, কী করব তাড়াতাড়ি বলুন ?
উঃ মিটারটা এক্ষুনি 'আপ' করে দাও।

সুসেন

হাসিখুশি

"তোমাকে ইংরেজিতে গোরু রচনা লিখতে বললাম আর তুমি কিনা আমায় ইংরেজি বর্ণমালা লিখে এনে দেখাচ্ছ ?"

"এর বাইরে তো আর কোনো অক্ষর নেই। আপনি শুধু একটু সাজিয়ে নিন, তাহলেই হবে।"

"আপনাকে একশো টাকা ধার দিয়েছিলাম—মনে আছে নিশ্চয়ই ?"

"মনে থাকবে না আবার ? আপনাকে যেদিন দুশো টাকা ধার দিলাম, তার পরের দিনই তো আপনার কাছ থেকে একশো টাকা নিলাম।"

"তখন থেকে তো শোবার ঘর, বসবার ঘর, লাইব্রেরি, বাগান—সবই দেখালেন। কই, রান্নাঘরটা তো দেখালেন না ?"

"আরে মশাই, আগে দেখুন এগুলোরই ভাড়া দিতে পারবেন কিনা। তারপর তো চিন্তা করবেন রান্নাঘরের।"

"রবীন্দ্রসংগীতের এত সুন্দর রেকর্ডটা ভেঙে ফেললে পাপান ? তোমার দেখছি বুদ্ধিসুদ্ধি নেই একটুও।"

"শুধু শুধু আমায় বকছ ! সেদিন গাওসকর রেকর্ড ভাঙতে তুমিই তো দু' হাত তুলে নেচেছিলে।"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

পোড়ো খনির প্রেতিনী

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

চিৎপুরে প্রচণ্ড ট্রাফিকজটে আমার গাড়ি আটকে গিয়েছিল। কেন যে শর্টকাট করার জন্য এই ঘিঞ্জি রাস্তায় ঢোকার দুর্বুদ্ধি হল, তাই ভেবে নিজের ওপর খাপ্পা হয়ে উঠছিলুম ক্রমশ। হঠাৎ চোখে পড়ল, ডানদিকের একটা দোকান থেকে লম্বাচওড়া এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখে আমার অতিপরিচিত ঋষিসুলভ সাদা দাড়ি। তিনি পা বাড়াতেই ফুটপাথের একটা ব্যস্তবাগীশ লোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাথার ছাইরঙা টুপিটা পড়ে গেল। টুপি কুড়োবার সময় তাঁর বিখ্যাত টাকও দেখতে পেলুম। আমি চেঁচিয়ে ডাকলুম, "কর্নেল!"

আমার বৃদ্ধ বন্ধু শুনতেই পেলেন না। ভিড়ের ভেতর মিশে গেলেন। এবার সেই দোকানের সাইনবোর্ডে চোখ পড়তেই চমক লাগল।

টি এন গুপ্ত অ্যাণ্ড কোং
সুলভে যাত্রা-থিয়েটারের পোশাক
ভাড়া পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

উত্তর কলকাতার এক প্রাচীন মন্দির থেকে কয়েক লক্ষ টাকার সোনাদানা চুরির খবর আনতে গিয়েছিলুম। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য। বেলা পড়ে এসেছিল। তাই খুব তাড়া ছিল। পত্রিকার অফিসে ফিরে খবরটা লেখার পর ফোন করলুম কর্নেলকে। ভেবেছিলুম, এতক্ষণে নিশ্চয় বাড়ি ফিরেছেন।

ওঁর ভৃত্য ষষ্ঠীচরণ ফোন ধরেছিল। বলল, "বাবামশাই সেই কখন বেইরেছেন, এখনও ফেরেননি দাদাবাবু। বলে গেছেন, ফিরতে অনেকটা রাত্তির হবে।"

মনে একটা চাপা উত্তেজনা রয়ে গেল। বাড়ি ফিরে রাত দশটা নাগাদ আবার ফোন করতেই যথারীতি ষষ্ঠীচরণের সাড়া পেলুম। সে খিকখিক করে হেসে বলল, "কাগুজে দাদাবাবু নাকি? ইদিকে এক কাণ্ড!"

"কী কাণ্ড, ষষ্ঠী? কর্নেল ফেরেননি?"

"ফিরেছেন আজ্ঞে। কিন্তু বললুম না? ইদিকে এক কাণ্ড হয়েছে!"

"কী মুশকিল! কাণ্ডটা কী?"

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

"আজ্ঞে, কাটামুণ্ডু।"

"কাটামুণ্ডু! তার মানে? কার কাটামুণ্ডু?"

"আবার কার? বাবামশাইয়ের। খি খি খি...।"

ভড়কে গেলুম। কর্নেলের কাটামুণ্ডু মানেটা কী? আর ষষ্ঠী এমন হাসছে কেন? শিউরে উঠলাম। কর্নেলের কাটামুণ্ডু ... ষষ্ঠীর অমন পাগলাটে হাসি! সর্বনাশ! তাহলে কি কর্নেলকে কেউ খুন করে গেছে আর তাই দেখে ষষ্ঠী পাগল হয়ে গেছে?

তক্ষুনি ফোন রেখে ঝটপট বেরিয়ে পড়লুম। রাস্তায় গিয়ে মনে হল, থানায় খবর দেওয়া উচিত হবে কি না। কিন্তু কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের মতো ধুরন্ধর এবং শক্তিমান মানুষ খুন হবেন, কিংবা গলায় নির্বিবাদে কাউকে কোপ বসাতে দেবেন, ভাবাই যায় না। আগে ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখা দরকার।

কিন্তু ইলিয়ট রোডে কর্নেলের বাড়ির সামনে কোনো ভিড় নেই। রাস্তা সুনসান খাঁ-খাঁ। হন্তদন্ত তেতালায় উঠে কলিং বেলের সুইচ টিপলুম। আমার হাত কাঁপছিল। শরীর ভারী হয়ে উঠেছিল। দরজা খুলে গেলে ষষ্ঠীচরণের মুখ দেখতে পেলুম। আমাকে দেখে সে চাপা খিকখিক হেসে ফিসফিস করে বলল, "ভারী মজার কাণ্ড, দাদাবাবু। দেখুন গে না।"

তাকে ঠেলে হন্তদন্ত ঢুকে পড়লুম। ড্রইংরুমের পর্দা তুলেই থমকে দাঁড়াতে হল। টেবিলের ওপর সত্যি সত্যি একটা কাটামুণ্ডু রয়েছে এবং সেটা কর্নেলেরই বটে। টাক এবং সাদা দাড়ি সবই ঠিকঠাক আছে। কিন্তু সেই কাটামুণ্ডের সামনে যিনি ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন, তিনি সম্ভবত কর্নেলের ভূত নন। কারণ তিনি চোখ তুলে আমাকে দেখলেন এবং মৃদুহাস্যে যথারীতি সম্ভাষণ করলেন, "হ্যাল্লো ডার্লিং!"

পাশে বসে আমি হো হো করে হেসে উঠলুম। তারপর বললুম, "আপনার ষষ্ঠীচরণটি এক অপূর্ব জিনিস! বলে কী, বাবামশাইয়ের কাটামুণ্ডু ..."

কর্নেল কথা কেড়ে বললেন, "ষষ্ঠী যে ভুল বলেনি, তা তো দেখতেই পাচ্ছ, জয়ন্ত! এখন বলো তো মুণ্ডুটা দেখে আমার বলে মনে হচ্ছে কি না?"

"আপনার ছাড়া আর কার?" মুণ্ডুটা দেখতে দেখতে বললুম। "একেবারে অবিকল। ওটা যদি রাস্তায় পড়ে থাকে, কেউ সন্দেহ করবে না যে ওটা নকল মুণ্ডু। এমনকী

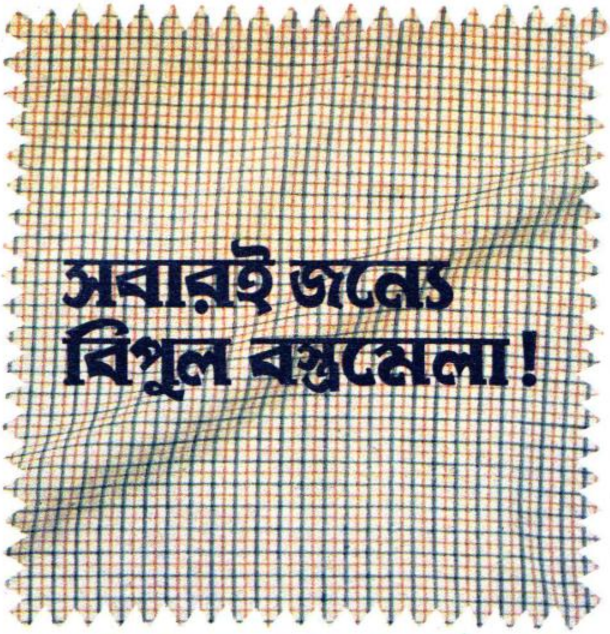
সবারই জন্যে
বিপুল বস্ত্রমেলা!

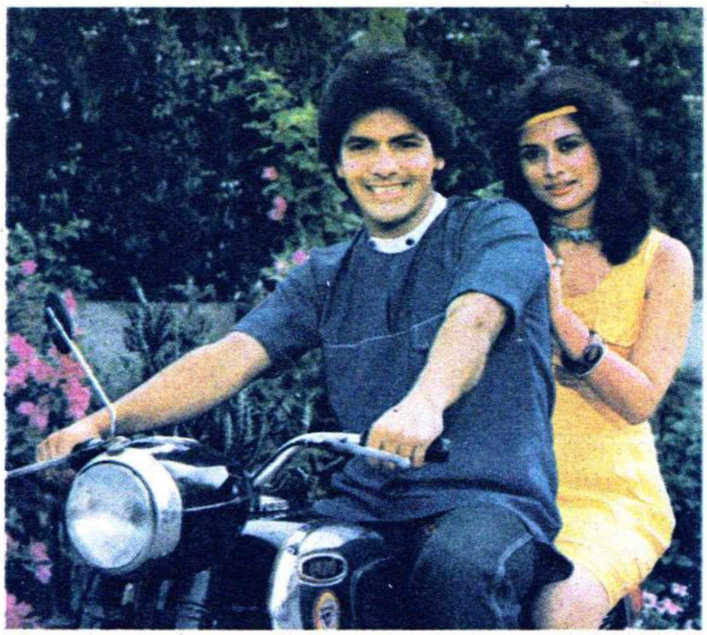

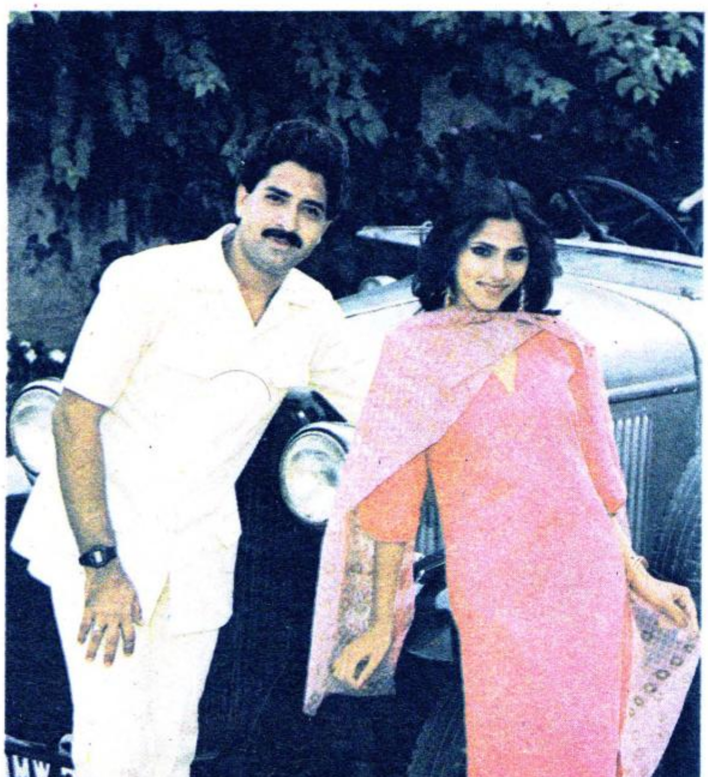

Interpub/BB/2/84/BEN

পোস্টমর্টেমের টেবিলে ডাক্তার যতক্ষণ না ছুরি চালাচ্ছেন, ততক্ষণ তিনিও ধরতে পারবেন না কিছু ! তাছাড়া টাকটিও নিখুঁত হয়েছে ।”

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে সহাস্যে বললেন, “ঠিক এমনটিই চেয়েছিলুম ।”

বললুম, “এটা কি চিৎপুরের টি এন গুপ্ত কোং থেকে অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছেন ?”

কর্নেল আমার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা দোলালেন । “তুমি আজ বিকেলে চিৎপুরে ট্রাফিকজটে আটকে গিয়েছিলে এবং আমাকে ডেকেছিলে, ঠিকই । কিন্তু তখন আমার বেজায় তাড়া ছিল । আশা করি, তুমি কুমোরটুলির প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী দেবেন পালের নাম শুনেছ । দেবেনবাবু ইদানীং পোশাকের দোকানের জন্য ডামি তৈরিতে খুব নাম করেছেন । চৌরঙ্গি এলাকার বহু পোশাকের দোকানে লাইফসাইজ মূর্তিগুলো ওঁরই তৈরি । আগে এসব জিনিস বিদেশ থেকে আনা হত । তবে সেসব মূর্তি অবশ্য সায়েব-মেমদের । এ যুগে সায়েব-মেম চলে না ।”

“আপনার এই কাটামুণ্ডুটা কি মাটির ?”

“মোটেও না । প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে তৈরি । দোকানের ডামিগুলোও তাই । মাটির মূর্তি ভেঙে যাবার চান্স থাকে ।”

“কিন্তু ব্যাপারটা কী খুলে বলুন তো ! গুপ্ত কোম্পানিতে কি আপনি পরচুলো কিনতে ঢুকেছিলেন ? আর এই কাটামুণ্ডুরই বা উদ্দেশ্য কী ?”

কর্নেল টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, “পরচুলো জিনিসটা বরাবর আমার চক্ষুশূল । বিশেষ করে যাত্রা-থিয়েটারের জন্য যেসব পরচুলো ভাড়া দেওয়া হয়, তাতে অসংখ্য উকুন থাকা সম্ভব । আর জয়ন্ত, সত্যি বলতে কী, টাক মানুষের চেহারায় জ্ঞানীর ব্যক্তিত্ব এনে দেয় । আমার টাক আমার বড় গর্বের জিনিস । তবে কাটামুণ্ডুর কথা জিজ্ঞেস করছ, এটা আমাকে ভালবেসে উপহার দিয়েছেন কুমোরটুলির দেবেনবাবু ! পুরো প্রতিমূর্তি গড়ে দিতে চেয়েছিলেন । আমি বলেছিলুম, অত পরিশ্রমের দরকার নেই । বরং আমার মাথাটা উপহার দিলেই আমি খুশি ।”

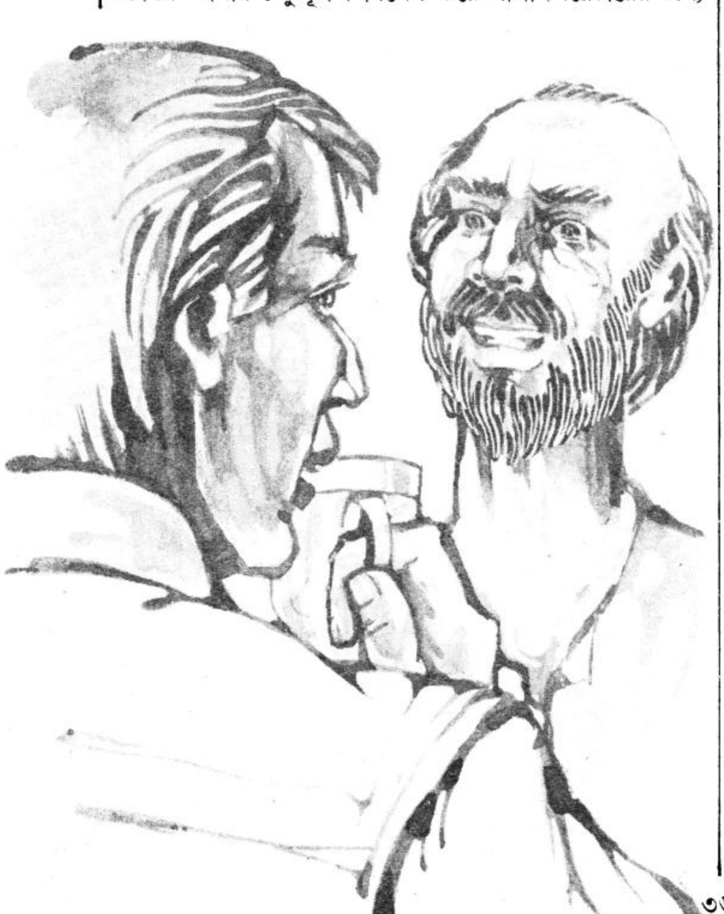

“বুঝলুম । কিন্তু টি এন গুপ্তের দোকানে তাহলে কেন ঢুকেছিলেন ?”

কর্নেল সে-কথার জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ চুরুট টানলেন । তারপর বললেন, “কাল থেকে দিন-চারেকের ছুটি নিতে পারবে জয়ন্ত ?”

“পারব । কেন ?”

“আমরা বেড়াতে যাব একজায়গায় ।”

“কোথায় ?”

কর্নেল চোখ বুজে গল্প বলার সুরে বললেন, “ধানবাদের ওদিকে ভৈরবগড় নামে একটা জায়গা আছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ওই এলাকায় অনেক খনি ছিল । এখন সবই পোড়ো হয়ে গেছে—যাকে বলে অ্যাবাণ্ডণ্ড্ মাইন । অর্থাৎ ভূগর্ভ থেকে তোলার মতো কোনো জিনিস আর নেই । নিয়ম হল, পোড়ো খনির মুখ সিল করে দিতে হয় । কিন্তু কজনই বা নিয়ম মানে ? অনেক খনির মুখ সিল করা হয়নি । কোনোটাতে জল জমে আছে, কোনোটায় গভীর গর্ত । ঝোপজঙ্গল গজিয়ে গেছে । গত শীতে খোলা খনিমুখগুলো থেকে জন্তুজানোয়ার বেরুতে দেখেছিলুম । তবে শেষ পর্যন্ত একটা দারুণ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল ।”

ষষ্ঠীচরণ কফির ট্রে রেখে গেল । পেয়ালায় কফি ঢালতে ঢালতে বললুম, “হুঁ । বলুন ।”

কর্নেল একটু হাসলেন । “জয়ন্ত, তুমি কি কখনও এমন অদ্ভুত প্রাণীর কথা শুনেছ—যার পায়ের পাতা উলটো, চোখদুটো সাপের মতো নিষ্পলক, যার চিৎকার শুনলে দুঃসাহসীরও শরীর আতঙ্কে হিম হয়ে যায় ?”

জোরে মাথা নেড়ে বললুম, “না ।”

“বলছি বটে প্রাণী, কিন্তু দেহাতি লোকেরা বলে পেত্নি । তুমি বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলের যেখানেই যাবে, দেহাতি লোকেদের কাছে এই সাংঘাতিক পেত্নির কথা শুনতে পাবে । উলটো দিকে পায়ের পাতা বলে এই পেত্নিকে মনে হবে পিছু হেঁটে তোমার দিকে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে । চোখে পলক পড়ে না । ঠাণ্ডাহিম সেই চোখে তাকিয়ে তোমার দিকে আসতে আসতে হঠাৎ সে বিকট চেঁচিয়ে উঠবে । সেই রক্ত-হিম-করা চিৎকার শুনলে তুমি তক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে । তখন পেত্নি তোমার মুণ্ডুটি মুচড়ে ছিঁড়ে নিয়ে রক্ত চুষে খাবে ।”

রাত সাড়ে দশটার কলকাতায় এই বিবরণ শুনতে শুনতে হেসেই ফেলতুম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোডশেডিং হয়ে গেল । অন্ধকারে মনে হল আমার খুব কাছেই পেত্নিটা দাঁড়িয়ে আছে । ঝটপট লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হলুম । একটু চুপ করে থাকার পর কর্নেল বললেন, “কিন্তু তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, পোড়োখনি এলাকায় জটাজূটধারী এক সাধুবাবাও

নাকি থাকেন। যাই হোক, ভৈর র পোড়োখনির ভেতর থেকে পেত্নিটা যদি আজ রাতে য়েও থাকে, কলকাতা পৌঁছুতে তার ভোর হয়ে যাবে। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, ডার্লিং।"

হৈ-চৈ করে বললুম, "কী যা-তা বলেন! আমি কি ভয় পেয়েছি নাকি?"

ষষ্ঠীচরণ একটা বাতি রেখে গেল। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "বিহার থেকে হিমাচল পর্যন্ত এই পেত্নির খুব নামডাক। ওরা বলে চুরাইল। কোথাও চুড়ৈল্‌ও বলে। বাংলার গ্রামে যাকে বলে শাঁখচুন্নি, সে আমলে ওই চুরাইলেরই বাঙালি রূপ। পেত্নির হাতে থাকে শাঁখের চুড়ি। তাই ওই নাম। বাংলায় শাঁখের চুড়ি-পরা পেত্নি অপভ্রংশে শাঁখচুন্নি হয়ে গেছে।"

"ভৈরবগড়ে আপনি তাহলে চুরাইল দেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ। জ্যোৎস্না ছিল। স্পষ্ট দেখতে পাইনি তার চোখদুটো নিষ্পলক কি না, কিংবা তার পায়ের পাতা সত্যি উলটো দিকে ফেরানো কি না। তবে তার চিৎকারটা শুনেছিলুম। চেরা গলার সেই চিৎকার টেনে-টেনে হিঁপিয়ে কখনও কান্নার মতো, কখনও তীব্র বিপদজ্ঞাপক সাইরেনের মতো। আমি ভীষণ হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। ব্যস্ততার মধ্যে টর্চটাও বিগড়ে গিয়েছিল। যখন আবার জ্বলল, তখন সে অদৃশ্য।"

"কিন্তু এতদিন পরে চুরাইল-রহস্য উদ্ধারে বেরুনোর কারণ কী? পেত্নিটা কি কারুর মুণ্ডু ছিঁড়ে রক্তপান করেছে?"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "করেছে।" তারপর উঠে গিয়ে কোনার টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ইনল্যাণ্ড লেটার এনে বললেন, "পড়ে দেখো।"

আলোর দিকে ঝুঁকে চিঠিটাতে চোখ রাখলুম। তাড়াহুড়ো করে লেখা। হরফগুলো বাঁকাচোরা।

প্রিয় কর্নেল,

ভৈরবগড়ে আবার চুরাইলের আবির্ভাব ঘটেছে। আগে মাঝেমাঝে যেমনটি দেখা গেছে, এবারও তেমনটি। দুজনের কাটামুণ্ডু আর ধড় পাওয়া গেছে। একফোঁটা রক্ত ছিল না। পুলিশ বলছে ডাকাতের কীর্তি। কিন্তু আমি জানি তা নয়। গত রাতে আমাদের বাড়ির পেছনের বাগানে চুরাইলের ডাক শুনেছি। তখন রাত প্রায় একটা। আমার অনিদ্রার কথা তো জানেন। ডাক শুনেই জানালা খুলে উঁকি দিয়েছিলুম। বন্দুক ছিল হাতে। কিন্তু লোডশেডিং চলছিল তখন। টর্চের আলোয় একপলক তার চেহারা দেখলুম। বুক কেঁপে উঠল। বন্দুক ছুঁড়তে পর্যন্ত পারলুম না ভয়ের চোটে। জানালা বন্ধ করে দিলুম। আমার খুব ভয় হচ্ছে, ওই দুজনের বাড়ির পেছনেও এমনি করে সে এসেছিল। দয়া করে আপনি শিগগির আসুন। ইতি,

যদুনারায়ণ দেব

কর্নেলের কাছ থেকে যখন বেরোলুম, তখন রাত প্রায় এগারোটা বেজেছে। তখনও ওই এলাকা জুড়ে লোডশেডিং। গাড়ির হেডলাইটের ছটায় অসংখ্য চুরাইল ভেসে উঠছিল যেন। আলোকিত এলাকায় পৌঁছে দেখি, ঘন কুয়াশা জমেছে। মার্চেও এবার শীত পিছু ফিরে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে প্রচুর কুয়াশা। কুয়াশার ভেতর পেত্নিটা যেন আমাকে

অনুসরণ করছিল। নিষ্পলক চোখে পিছু হেঁটে হেঁটে সে এগোচ্ছিল। গাড়ির গতি বাড়িয়েও তাকে যেন ফেলে যেতে পারছিলুম না। বাড়ি পৌঁছে গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে যখন বেরুচ্ছি, তখনও মনে হল সে গেটের বাইরে নিষ্পলক ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে গিয়ে ঘরে ঢোকার পর কতক্ষণ কান পেতে থাকলুম, কিন্তু তার ডাক শুনতে পেলুম না। তখন নিজের মিথ্যে ভয়ের কথা ভেবে খুব লজ্জা হল। ...

॥ দুই ॥

খনি এলাকা যতটা রুক্ষ দেখায়, ভৈরবগড় ততটা রুক্ষ নয়। শহর আর গ্রামে মেশানো একটা জনপদ। খনিগুলো অ্যাবাণ্ডণ্ড হয়ে ভৈরবগড়ের জৌলুস পড়ে গেছে কবে। রেলস্টেশন আছে বটে, তার চেহারাও খাঁ খাঁ। ঢেউখেলানো মাটি, ছোটবড় টিলা আর পাহাড়, বনজঙ্গল নিয়ে কেমন একটা আদিম পরিবেশ।

যদুনারায়ণ দেবের বাড়িটা বেশ পুরনো। তিনপুরুষ আগে ওঁরা বাংলা থেকে এ মুল্লুকে এসেছিলেন খনি-ব্যবসা করতে। এখন অবস্থা আগের মতো জমকালো নয়। বাড়িতে আছেন যদুনারায়ণ, তাঁর ছোটভাই রুদ্রনারায়ণ, যদুবাবুর সাত-আট বছর বয়সী মেয়ে পিঙ্কি, আর যদুবাবুর মা করুণাময়ী। যদুবাবুর স্ত্রী বেঁচে নেই। রুদ্রবাবু এখনও বিয়ে করেননি। ধানবাদে একটা কোম্পানিতে চাকরি করেন। রোজ ট্রেনে যাতায়াত করেন।

পেছনে বাগানের দিকের একটা ঘরে আমরা উঠেছি। বাগান

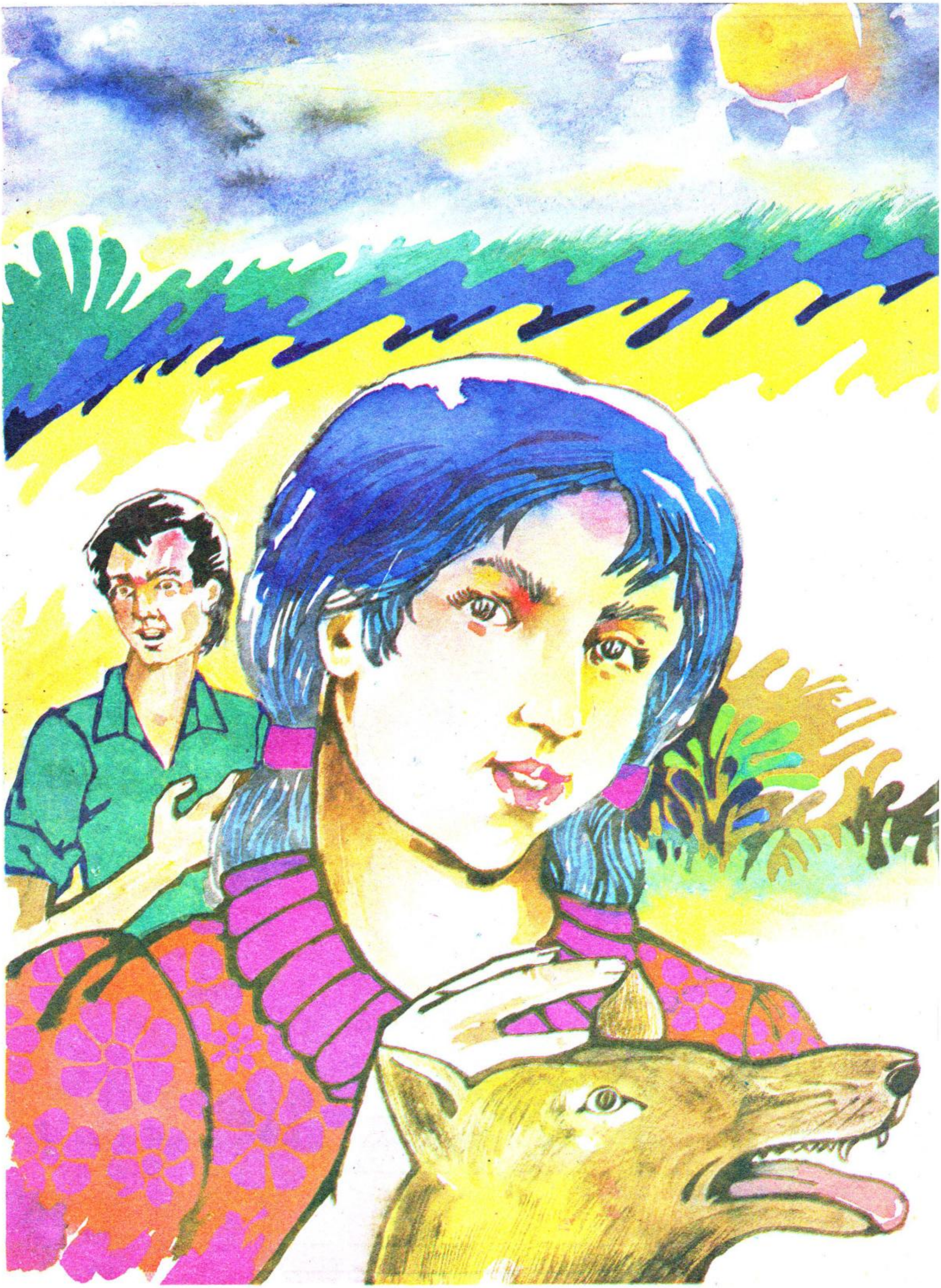

অবশ্য নামেই। তিন একর জায়গা জুড়ে গাছপালা ঝোপঝাড় গজিয়ে আছে। একটা প্রকাণ্ড আর চ্যাপ্টা টিলার মাথায় বাড়িটা। বাগানের শেষপ্রান্তে দাঁড়ালে অনেক দূর দেখা যায়। ওই দিকটায় সেইসব পোড়োখনি আছে।

কর্নেল যদুবাবুকে নিয়ে বেরিয়েছেন কোথায়। রাত জেগে ট্রেনে এসেছি। ক্লান্তিও বটে, চোখদুটোও জ্বালা করছে। তাই ওঁদের সঙ্গে যাইনি। বাগানের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে বেড়া ডিঙিয়ে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে একটা পাথরে বসে ছিলুম।

দিন-দুপুরে পেত্নির ভয় থাকার কথা নয়। কিন্তু পোড়োখনি এলাকার দিকে তাকিয়ে কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। সেইসময় কোত্থেকে সাদা রঙের একটা ছোট্ট কুকুর দৌড়ে এসে আমার পা শুঁকে জুলজুল চোখে আমাকে দেখতে থাকল। অবাক হয়ে ভাবছি, কুকুরটা কার, এমন সময় ওপাশের ঝোপ থেকে যদুবাবুর মেয়ে পিঙ্কি ডাক দিল, "কুকি! কুকি!"

কুকুরটার সারা গায়ে লোম। গা ঝাড়া দিয়ে সে মুখ ঘোরাল। পিঙ্কি তার কাছে এসে ধমক দিল, "কী? কথা কানে যাচ্ছে না বুঝি? চাঁটি খাবি বলে দিচ্ছি। চলে আয়!"

বললুম, "তোমার কুকুর বুঝি? ভারী সুন্দর তো কুকুরটা!"

পিঙ্কি আমার কথায় কান দিল না। সে কুকুরটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে ঢাল বেয়ে দৌড়তে শুরু করল। তারপর নীচের সমতলে গিয়ে কুকরটাকে নামিয়ে দিল। দেখলুম, এবার কুকুরটা অর্থাৎ কুকি তার পেছন-পেছন হাঁটছে। একটু পরে পিঙ্কি ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেয়েটা তো বড্ড সাহসী দেখছি! এসেই শুনেছি, চুরাইলের আতঙ্কে লোকে সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ঢুকে পড়ে। বাজার-এলাকা শিগগির নিশুতি সুনসান হয়ে যায়। এমনকী দিনের বেলাতেও কেউ একাদোকা মাঠেঘাটে পা বাড়ায় না। আর অতটুকু মেয়েটা দিব্যি একা ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই এলাকায়!

কিছুক্ষণ পরে উঁচু একটা জায়গায় ফ্রকপরা পিঙ্কির মূর্তি ভেসে উঠল। তার পায়ের কাছে কুকি। দুজনে খুব মন দিয়ে কী যেন দেখছে।

তারপর কুকিকে লাফাতে লাফাতে ওপাশে চলে যেতে দেখলুম। পিঙ্কিও তার পেছনে ছুটল। সিগারেট ধরিয়ে ওদের গতিবিধি লক্ষ করতে থাকলুম। কখনও ওরা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার ওদের দেখতে পাচ্ছি। তারপর কতক্ষণ আর দুটিকে দেখতেই পেলুম না।

কেমন একটা অস্বস্তি লাগল। লম্বা পায়ে ঢাল বেয়ে নেমে গেলুম। ওদের শেষবার যেখানে দেখেছি, সেইদিকে হাঁটতে থাকলুম। জায়গাটা উঁচুনিচু, এবড়ো-খেবড়ো। অজস্র খানাখন্দ, কোথাও গভীর গর্ত, নানা গড়নের পাথর পড়ে রয়েছে। মধ্যে-মধ্যে ঝোপঝাড় বা কিছু গাছ। এপাশে-ওপাশে টিলা। একটা পাথরে উঠে ওদের খুঁজলুম। তারপর দেখলুম, একখানে দাঁড়িয়ে পিঙ্কি একটু ঝুঁকে কী করছে। কুকিকে দেখতে পেলুম না।

চেঁচিয়ে ডাকলুম, "পিঙ্কি! পিঙ্কি!"

পিঙ্কি আমার দিকে ঘুরে হাত নেড়ে কী বলল। তখন দৌড়ে ওর কাছে চলে গেলুম। গিয়ে দেখি, পিঙ্কির সামনে একটা স্তূপের কিনারায় গুহার দরজার মতো প্রকাণ্ড একটা

খোঁদল। সেইদিকে হাত বাড়িয়ে পিঙ্কি কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, "কুকি ওর ভেতর ঢুকে গেল। আর বেরুচ্ছে না—এত ডাকছি!"

খোঁদলের কাছে গিয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলুম। ফুট-চারেক গভীর একটা গর্ত—তারপর সুড়ঙ্গের মতো ভেতরে চলে গেছে খোঁদলটা। গর্তে ঘাস আর সামান্য ঝোপঝাড় গজিয়ে আছে। পিঙ্কি ব্যাকুলভাবে ডাকছিল, "কুকি! কুকি!" সে শাসাচ্ছিল। আমিও "কুকি" বলে ডাকাডাকি করলুম। কিন্তু কুকুরটার পাত্তা নেই।

এইসব গর্তের ভেতর নেকড়ে, চিতাবাঘ বা হায়না থাকাও সম্ভব। তাদের পাল্লায় পড়ল না তো বোকা কুকুরটা? বললুম, "দেখো তো কী বিপদ হল! ওকে নিয়ে কেন এখানে এসেছিলে!"

পিঙ্কি চোখ মুছতে মুছতে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "রোজই তো আসি। কুকির সঙ্গে লুকোচুরি খেলি।"

"কুকি ওখানে ঢুকতে গেল কেন?"

পিঙ্কি মাথা নেড়ে বলল, "জানি না। হঠাৎ ঢুকে গেল।"

খোঁদলটাতে মানুষের পক্ষেও ঢোকা সম্ভব। নিশ্চয় একটা পোড়োখনির মুখ এটা। ভেতরে ঘন অন্ধকার থমথম করছে। টর্চ থাকলে ঢুকতে পারতুম। তাই বললুম, "তুমি এক কাজ করো বরং। দৌড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে একটা টর্চ নিয়ে এসো। তোমার কুকিকে উদ্ধার করা যাবে।"

পিঙ্কি তখুনি দৌড়ল। আমি পাশের একটা ঝোপ থেকে লাঠির মতো একটা ডাল ভেঙে নিলুম। সঙ্গে রিভলভারটা নেই। থাকলে ভাল হত। অগত্যা লাঠি ভরসা করেই ঢুকতে হবে।

সবচেয়ে কমদামে
সবসেরা কোয়ালিটি
বিরাট অফ সীজন ছাড়
POLAR
ঠিক তাই। এখনই পোলার পাখা কেনা সবচেয়ে লাভের কারণ বছরের কেবল এই মাসেই তা পাওয়া যায় সবচেয়ে কম দামে। এরপর প্রতিমাসেই দাম বাড়বে। সুতরাং আজই কিনুন — পোলার — আগামীকাল অনেক দেরী হয়ে যেতে পারে।
পোলার
সুপার পাখা
আজ্ঞে হ্যাঁ
এটি ৭ বছরের
গ্যারান্টিযুক্ত
iaa 2448

লাঠিটা হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে লোক খুঁজছিলুম, যদি দৈবাৎ কোনো দেহাতি লোক পেয়ে যাই, সেও মন্দ হবে না। পয়সার লোভে তাকে ওই খোঁদলে ঢুকিয়ে কুকিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা যায়। নাহলে অগত্যা নিজেকেই ঢুকতে হবে।

হঠাৎ একটু দূরে উঁচু পাথরের আড়াল থেকে কাউকে বেরুতে দেখলুম। সে ফাঁকায় পৌঁছুলে অবাক হয়ে দেখি, লাল কাপড়পরা এক সন্ন্যাসী। চেঁচিয়ে ডাকলুম, "সাধুবাবা ! সাধুবাবা !"

সাধুবাবা ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আমাকে দেখেই সাঁত করে আবার উঁচু পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিল। তারপর আর তাকে দেখতে পেলুম না। ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত তো ! কর্নেল এই সাধুবাবার কথা বলেছিলেন না ?

একটু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে পিঙ্কি ফিরে এল। টর্চ এনেছে। ওর সঙ্গে ওদের চাকর দশরথও এসেছে। দশরথের সঙ্গে সকালে আলাপ হয়েছে। লোকটার বয়স হয়েছে বটে, এখনও চেহারাটি শক্তসমর্থ। হাসতে হাসতে বলল, "কুকি কেন ঢুকেছে, হামার মালুম হয়েছে স্যার ! ভৈরবগড়ের কুত্তাদের কাছে কুকি শুনেছে কী, ইয়ে সব গুহার অন্দরে করাড়ি রোটি মিলতে পারে।"

জিজ্ঞেস করলুম, "করাড়ি রোটি কী দশরথ ?"

দশরথ বলল, "ইয়ে সব গুহার অন্দরে ভালুকের ডেরা আছে। ভালুক মৌচাক ভেঙে মধু খায়। ঔর জঙ্গলের ফলভি খায়। খেয়ে সেইসব চিজ উগরে দেয়। যখন শুখা হয়, তখন তা রোটি হয়ে যায়। আদমিলোগভি ওহি রোটি পছন্দ করে। হামিভি একদফা খায়া স্যার ! বহুত মিঠা।"

"তা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু ভেতরে ভালুক থাকলে যে বিপদ !"

দশরথ হাসল। "ভালুক অন্দরে আছে কি না কুত্তার মালুম আছে, স্যার ! ভালুক থাকলে কুত্তা অন্দরে ঘুসবে না।"

ঠিক এইসময় খোঁদল থেকে একলাফে কুকি বেরিয়ে এল। মুখে এক টুকরো কালচে রঙের পাউরুটির মতো জিনিস। দশরথ লাফিয়ে উঠল, "দেখিয়ে, দেখিয়ে ! হাম ঠিক বোলা কি না !"

পিঙ্কি কুকিকে কোলে তুলে নিয়ে আলতো দুটো চাঁটি মারল। তারপর তার মুখ থেকে করাড়ি রোটির টুকরোটা কেড়ে ছুঁড়ে ফেলল। দশরথ সেই টুকরোটা তুলে নিয়ে বলল, "ফেকো মাত দিদি ! ইয়ে রোটি যে খাবে, সে তাকতওয়ালা পালোয়ান হয়ে যাবে।"

দশরথ আমাকে অবাক করে কুকুরের এঁটো সেই বিচিত্র বস্তুটি মাথায় ঠেকাল প্রসাদের মতো। তারপর ঝেড়েমুছে পকেটে ঢোকাল। তার মুখে খুশি উপছে উঠছিল।

হাঁটতে-হাঁটতে দশরথকে বললুম, "আচ্ছা দশরথ, ওখানে একজন সাধুবাবাকে দেখলুম। কিন্তু যেই আমি ওঁকে ডেকেছি, উনি লুকিয়ে পড়লেন কোথায়। ব্যাপারটা কী ?"

দশরথ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আমার মুখের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "সাচ ?"

"হ্যাঁ। একজন সাধুবাবাকে সত্যি দেখেছি, দশরথ।"

দশরথের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, "আপনি বহত্ পুণ্যবান স্যার, তাই দেখা পেলেন। ওখানে একজন সাধুবাবা থাকেন। লেকিন কেউ তাঁর দেখা পায় না। যারা পায়, তারা বহুত পুণ্যবান আদমি।"

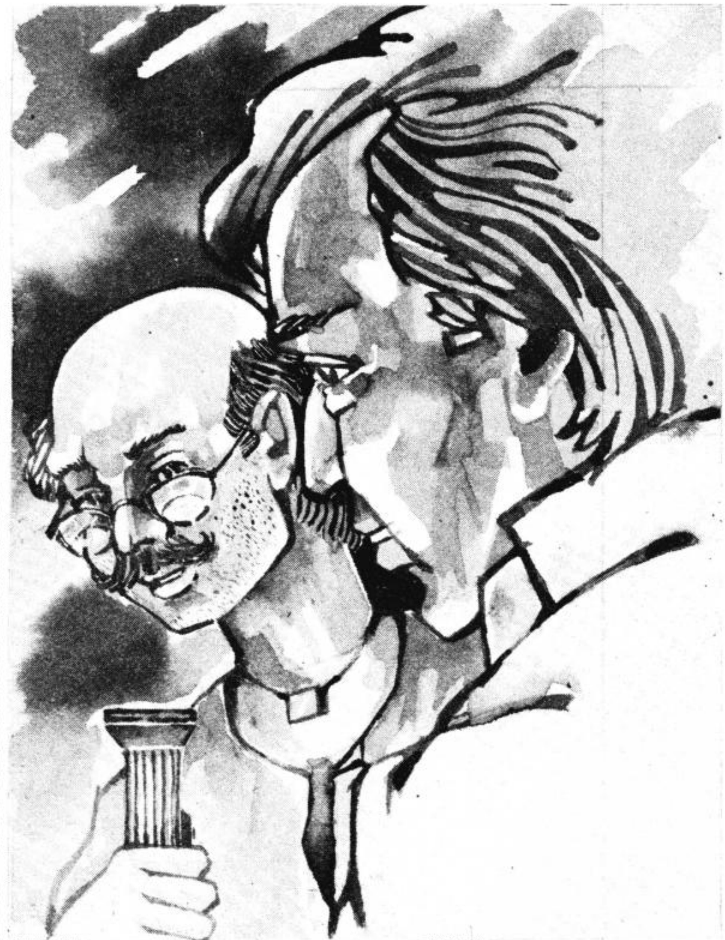

"তুমি কখনও দেখা পাওনি ?"

"না স্যার ! শুনা কি, সাধুবাবার ওমর দোশো বরষ আছে।"

"বলো কী ? দুশো বছর বয়স !"

"জি হাঁ। ভৈরবগড়ে যাকে পুছ করবেন, সে বলবে।"

"তাহলে দশরথ, সেই চুরাইলটা কি সাধুবাবার পোষা পেত্নি ?"

আমি হাসতে হাসতে বললুম কথাটা। দশরথ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠে দু-কানে আঙুল ঢুকিয়ে বলল, "রাম রাম ! এই মুলুকে যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ উও নাম মুখে লিবেন না স্যার !"

বলে সে চলার গতি বাড়িয়ে দিল। তার চেহারায় আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল।

কর্নেল ও যদুবাবু বাগানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। দশরথ কুকির কীর্তি বর্ণনা করল এবং ফতুয়ার পকেট থেকে ভালুকের বানানো রুটির টুকরোটাও দেখাল। যদুবাবু পিঙ্কিকে একটু বকাবকি করলেন। তারপর বললেন, "ওকে নিয়ে এই সমস্যা। যতক্ষণ স্কুলে থাকে, চিন্তা করি না। কিন্তু বাড়িতে থাকলেই কুকুর নিয়ে পোড়োখনির ওদিকে চলে যাবে। অথচ ইদানীং ভুলেও ভৈরবগড়ের লোকেরা ওদিকে পা বাড়ায় না।"

কর্নেল দশরথের কাছ থেকে করাড়ি রোটির টুকরো নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। ফেরত দিয়ে বললেন, "করাড়ি রোটির কথা দক্ষিণ ভারতের জঙ্গল এলাকায় গিয়ে শুনেছিলুম। এবার স্বচক্ষে দেখলুম।"

যদুবাবু বললেন, "করাড়ি কেন বলে কে জানে !"

কর্নেল বললেন, "তামিল ভাষায় ভালুককে বলে করাড়ি ।"

দশরথ সবার মুখের দিকে তাকিয়ে উসখুস করছিল । চাপা গলায় যদুবাবুর উদ্দেশে বলল, "বড়বাবু, এই কলকাতার স্যারকে খনির সাধুবাবা দর্শন দিয়েছেন ।"

যদুবাবু চমকে উঠে বললেন, "তাই নাকি জয়ন্তবাবু ?"

বললুম, "হ্যাঁ । কয়েক সেকেণ্ডের জন্য লাল কাপড় পরা জটাধারী এক সাধুবাবাকে দেখেছি ।"

যদুবাবু কর্নেলকে বললেন, "আপনি কথাটা আমল দিচ্ছিলেন না কর্নেল ! তাহলে দেখুন, যা রটে তা সত্যি বটে ।"

কর্নেল একটু হাসলেন । "আমল দিইনি, তা নয় । বলছিলুম, বিশ্বাস করা যায় এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শী কাউকে পেলে ভাল হয় । যাই হোক, জয়ন্ত যখন দেখেছে, তখন গুজবটা সত্য প্রমাণিত হল ।"

কর্নেলের বুকে বাইনোকুলার ঝুলছিল । কথাটা বলার পর বাইনোকুলারটা চোখে রেখে পোড়োখনি এলাকার দিকে কী যেন দেখতে থাকলেন । যদুবাবু খুব আগ্রহে চাপা গলায় বলে উঠলেন, "কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি কর্নেল ?"

কর্নেল বললেন, "লাল ঘুঘু ।"

"লাল ঘুঘু মানে ?" যদুবাবুর গলায় নৈরাশ্য ফুটে উঠল । "আমি ভাবলুম বুঝি সাধুবাবাকে দেখতে পেয়েছেন !"

কর্নেল বললেন, "এই লাল ঘুঘুপাখির ঝাঁক সচরাচর দেখা যায় না । এরা ঊষর মরু অঞ্চলের বাসিন্দা । শীতের শেষদিকে চলে আসে উর্বর এলাকায় । বর্ষা পর্যন্ত কাটিয়ে আবার ফিরে যায় ।" বলে কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে এক-পা এক-পা করে হাঁটতে শুরু করলেন । বুঝলুম এবেলার মতো উধাও হতে চলেছেন । যদুবাবু একটু হেসে বললেন, "যার যা হবি ! আসুন, জয়ন্তবাবু । আমরা ঘরে বসে গল্পগুজব করি ততক্ষণ ।"

যে ঘরে উঠেছি, সেই ঘরে গিয়ে বসলুম দুজনে । দশরথ চা আনতে গেল । পিঙ্কি তার কুকুর নিয়ে বাগানে খেলে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছিলুম । যদুবাবু বললেন, "জয়ন্তবাবু, আপনি তো খবরের কাগজের লোক । এমন ঘটনা কখনও ঘটতে দেখেছেন ?"

"কী ঘটনা বলুন তো ?"

"ভূতপ্রেতের হাতে মানুষ খুন !" যদুবাবুর কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক ফুটে উঠল । "পুলিশ বলছে স্রেফ ডাকাতি । কিন্তু বলুন তো মশাই, ডাকাত কি মানুষের মুণ্ডু কেটে রক্ত খায় ?"

"তা খায় না বটে ।"

যদুবাবু জানালার বাইরেটা দেখিয়ে বললেন, "আজ রবিবার । গত বুধবার রাত একটায় ওইখানে স্পষ্ট দেখেছি চুরাইল দাঁড়িয়ে আছে । শাড়ি পরা কালো চেহারা । হাতে শাঁখা পরা, চোখদুটো নীল । টর্চের আলোয় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য হলেও তাকে স্পষ্ট দেখে নিয়েছি । মুখের চেহারা দেখলে রক্ত হিম হয়ে যাবে, মশাই ! এই দেখুন না, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে !"

"চুরাইলের পায়ের পাতা নাকি উলটো দিকে থাকে ?"

"হুঁ । ঠিক তাই । টর্চের আলো ছিল খুব জোরালো । পা-দুটোও দেখে নিয়েছি না ?"

"যে দুজন লোক চুরাইলের হাতে মারা পড়েছে, তারা কে ?"

যদুবাবু হতাশভাবে একটু হাসলেন । "তাদের বাড়িই তো নিয়ে গিয়েছিলুম কর্নেলকে । একজনের নাম মাধব পাণ্ডে । বাজারের সেরা ব্যবসাদার ছিলেন পাণ্ডেজি । মহাজনী কারবারও ছিল । সুদে টাকা ধার দিতেন অভাবী লোককে । দ্বিতীয়জন হলেন রামনাথ মিশ্র । লোকে বলত মিছিরজি । উনি ছিলেন বড্ড ভালমানুষ । পাণ্ডেজিরই কর্মচারি উনি ।"

"ওঁরা খুন হয়েছেন কীভাবে ?"

"বোঝা যাচ্ছে না, কেন পাণ্ডেজি অত রাতে বেরিয়েছিলেন । ঘরের দরজা খোলা ছিল । ভোরবেলা স্টেশনের কাছে মুণ্ডুকাটা লাশ পাওয়া যায় । তবে রাতে বাড়ির লোকে তো বটেই, পাশের বাড়ির লোকেরাও চুরাইলের ডাক শুনেছিল । মিছিরজি খুন হন তার পরের রাতে । মিছিরজিও স্টেশনের কাছে একটা বস্তিতে থাকতেন । তাঁরও ঘরের দরজা বাইরে থেকে আটকানো ছিল । পেছনের জঙ্গলে তাঁর মুণ্ডুকাটা লাশ পাওয়া গেছে । তাছাড়া সে-রাতেও ওই বস্তির লোকেরা চুরাইলের ডাক শুনেছিল ।"

"কর্নেল কী বলছেন ?"

"কিছু বলেননি এখনও । ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন । লাশ পড়ে থাকা জায়গাটাও দেখলেন । তারপর বললেন, 'চলুন ফেরা যাক ।'"

বুঝলুম যদুবাবু খুব হতাশ হয়ে গেছেন কর্নেলের হাবভাব দেখে ।

॥ তিন ॥

লাল ঘুঘুর পেছনে সারা দুপুর ঘোরাঘুরি করে কর্নেল ফিরে এলেন বেলা গড়িয়ে । আমার খাওয়াদাওয়া সারা । অবেলায় কর্নেল খেতে বসলেন । বললুম, "এরকম অনিয়ম করলে কিন্তু বেঘোরে মারা পড়বেন । আপনি কি ভাবছেন এখনও বুড়ো হননি ?"

কর্নেল সহাস্যে বললেন, "বৎস, সাদা দাড়ি মোটেও বার্ধক্যের লক্ষণ নয় । তোমার মতো অনেক যুবকেরও চুলদাড়ি সাদা হয়ে যেতে দেখেছি । ভেবো না, জীবনে দু-একটা দিন দেরি করে খেলে স্বাস্থ্যমশাই তত বেশি চটেন না । যাই হোক, তুমি তৈরি হয়ে নাও । বেরুব ।"

যদুবাবুর অনিদ্রার রোগ আছে । রাতে ঘুম হয় না বলে দিনে ঘুমোবার চেষ্টা করেন । দশরথ খাবার এনেছিল । যদুবাবুর মা করুণাময়ী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একবার তদারক করে চলে গেছেন । খাওয়ার পর কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, "আচ্ছা দশরথ, তোমাদের ছোটবাবু কোথায় গেলেন ? আজ ছুটির দিনে তো তাঁর বাড়ি থাকার কথা !"

দশরথ বলল, "ছোটবাবুর খোবর ছোটবাবুরই মালুম আছে স্যার ! উনহি ওই রোকম আছেন ।"

"কী রকম ?"

দশরথ এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, "রাতমে বড়বাবুর সঙ্গে বহুত কাজিয়া কোরেছিলেন । সুবেমে চাও-উও পিয়ে চলে গেলেন তো আভিতক আসলেন না । মাইজির সঙ্গে ভি কাজিয়া কোরেন ছোটবাবু !"

"কেন বলো তো ?"

দশরথ হাসল । "রুপেয়াকে লিয়ে । হরঘড়ি রুপেয়া চাইলে কেত্তো রুপেয়া দেবেন বড়বাবু ? মাইজিই বা কোথা রুপেয়া

পাবেন বলুন স্যার ?"

"রুদ্রবাবু তো চাকরি করেন। মাইনের টাকাতেও কুলোয় না নাকি ?"

দশরথ মুখ বেজার করে বলল, "ছেড়িয়ে দিন স্যার। ছোটবাবু জুয়াড়ি হোয়ে গেছেন !"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "তাই বলো ! জুয়া খেললে মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি আর থাকে না। কই, এসো জয়ন্ত। আমরা বেরোই।"

যদুবাবুর ভাই রুদ্রবাবুর সঙ্গে সকালে আমাদের সৌজন্যমূলক পরিচয় হয়নি। তবে ওঁকে দেখেছিলুম। রোগা গড়নের যুবক। রাগী চেহারা। গায়ে লালরঙের গেঞ্জি, পরনে ছিল নেভি-ব্লু প্যান্ট। হাতে স্টিলের বালা। গলায় সরু চেনও দেখেছিলুম।

পোড়োখনি এলাকার দিকে পা বাড়িয়ে কর্নেল বললেন, "যদি রাত্রি পর্যন্ত এদিকে কাটাই, আমার বিশ্বাস চুরাইলের দর্শন পাব। কিন্তু তুমি ভয় পাবে না তো জয়ন্ত ?"

অবাক হয়ে বললুম, "আপনি কি চুরাইল দেখতেই বেরুলেন ?"

কর্নেল আস্তে বললেন, "বলা যায় না, যদি দৈবাৎ তার দেখা পেয়ে যাই গতবারের মতো।"

মার্চ মাসের এমন সুন্দর বিকেলে চুরাইলের ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। সত্যি বলতে কী, ভূতপ্রেতে আমার কস্মিনকালে বিশ্বাস নেই, যদিও ভূতের ভয় আমার আছে। কিন্তু কর্নেল গত বছর স্বচক্ষে পোড়োখনির পেত্নিটাকে দেখেছেন বলছিলেন। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যায় না।

কর্নেল মাঝে-মাঝে বাইনোকুলার তুলে এদিকে-ওদিকে কী দেখছেন। এখনও দিনের আলো আছে। কাজেই নিশ্চয় লাল-ঘুঘুর ঝাঁক দেখছেন। একখানে হঠাৎ থেমে বললেন, "জয়ন্ত, করাড়ি রোটি কোন্ গুহায় ছিল চিনতে পারবে কি ?"

বললুম, "মনে হচ্ছে, বাঁ দিকে যেতে হবে। ওই যে ঝোপগুলো দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত তার কাছাকাছি।"

কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দেখলুম, পিঙ্কি হাতে একটা প্রকাণ্ড রঙিন বল নিয়ে একটা ঢিবির ওপর উঠে দাঁড়াল। তারপর বলটা ছুঁড়ে দিল। তখন ওর কুকুরটাকেও দেখতে পেলুম। অবাক হয়ে গেলুম ওর সাহস দেখে। কুকি বলটাকে কামড়ে ধরে ওর কাছে বয়ে আনার চেষ্টা করছে। বলটা বারবার মুখ থেকে পড়ে যাচ্ছে। কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "মেয়েটি সত্যি খুব সাহসী।"

ডাকলুম, "পিঙ্কি ! পিঙ্কি !"

পিঙ্কি একবার ঘুরে দেখল। তারপর একহাতে বল অন্য হাতে কুকুরটাকে তুলে নিয়ে দৌড়তে শুরু করল। একটু পরে দুজনেই কোথাও উধাও হয়ে গেল। বললুম, "মেয়েটির জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে, কর্নেল ! কখন না কোন্ বিপদে পড়ে !"

কর্নেল সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, "করাড়ি রোটির গুহাটা খুঁজে বের করো, জয়ন্ত !"

খুঁজে পেতে দেরি হল না। কর্নেল পকেট থেকে টর্চ বের করে বললেন, "তুমি এখানে বসে অপেক্ষা করো জয়ন্ত। আমি ভেতরটা দেখে আসি।"

আঁতকে উঠে বললুম, "সে কী ! আপনি ওর ভেতর ঢুকে কী করবেন ?"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "করাড়ি রোটি খেলে মানুষ পালোয়ান হয়ে যায়, ডার্লিং !"

"কিন্তু ভেতরে যদি ভালুকটা থাকে ?"

"তার সঙ্গে ভাব জমাবার মন্ত্র আমার জানা আছে।" এই বলে কর্নেল কুয়োর মতো গর্তটাতে নেমে গেলেন। তারপর টর্চ বাগিয়ে সুড়ঙ্গের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলেন।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছে, এক্ষুনি হয়তো দেখব কর্নেল ভালুকের আঁচড় খেয়ে রক্তারক্তি হয়ে এবং কোনোমতে প্রাণ নিয়ে ফিরেছেন। না, ভালুকের হাতে ওঁর মারা পড়ার কথা ভাবছি না। কারণ ওঁর কাছে রিভলভার আছে। কিন্তু ভালুকমশাই রুটিচোরকে একটু শিক্ষা না দিয়ে কি ছাড়বে ?

তারপর আর কর্নেলের ফেরার নাম নেই। বেলা পড়ে এল। টিলাগুলোর ওধারে সূর্য অস্ত গেল। কুয়াশা ঘনিয়ে এল চারদিকে। ক্রমে আঁধার জমল। কর্নেল ফিরছেন না। অস্বস্তিতে বুক কাঁপছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে পিঙ্কিকে খুঁজলুম। কোথাও দেখলুম না। নিশ্চয় মেয়েটা এতক্ষণ তার কুকুরটাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। দুরু-দুরু বুকে ভাবছি কী করব। আমার সঙ্গেও টর্চ আর রিভলভার আছে। ঢুকব নাকি ভেতরে ? কিন্তু ঠিক তখনই বাঁ দিকে খুব কাছেই এক বিকট চিৎকার শুনতে পেলুম।

ঘুরে কিছু দেখতে পেলুম না। অন্ধকারে কেউ ওই বিদ্‌ঘুটে আর্তনাদ করে চলেছে। কাঁপা-কাঁপা একটানা চেরা গলার চিৎকার—বিপদজ্ঞাপক সাইরেনের মতো। অমনি শরীর হিম হয়ে গেল। এ তো চুরাইলেরই চিৎকার ! কর্নেল ঠিক এমনি একটা বর্ণনা দিয়েছিলেন।

আড়ষ্ট হাতে টর্চের বোতাম টিপলুম। একঝলক আলো

সুপার রিন
আপনাকে যোগায় বাড়তি শুভ্রতা
আর কোন ডিটারজেন্ট ট্যাবলেটের যে সাধ্য নেই

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন। LINTAS RIN 75 2316 BG

ছড়িয়ে গেল। তারপর দেখতে পেলুম পোড়োখনির সেই পেত্নিটাকে। কালো কুচকুচে গড়ন। মানুষের মতো—কিংবা আদতে মানুষের মতো নয়ই, আমার চোখের ভুল হতেও পারে। কী হিংস্র তার মুখ আর নিষ্পলক নীলচে দুটো চোখ! তার পায়ের পাতা সত্যি উলটো ঘোরানো কিনা দেখার চেষ্টা করতেই সে আবার চেঁচিয়ে উঠল—আঁ আঁ আঁ আঁ⋯ইঁ ইঁ ইঁ ইঁক্! এমন অমানুষিক চিৎকার কোনো প্রাণীর নয়, তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

টর্চের আলোয় তাকে এগিয়ে আসতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে রিভলভার বের করলুম। তার দিকে তাক করে ট্রিগারে চাপ দিলুম। রিভলভারটা অটোমেটিক। কিন্তু আশ্চর্য, গুলি বেরুল না। ঘাবড়ে গিয়ে আবার ট্রিগারে চাপ দিলুম। এবারও গুলি বেরুল না। অমনি মনে পড়ল, অটোমেটিক বলে রিভলভারে গুলি ভরে রাখিনি। কারণ দৈবাৎ গুলি ছুটে যাবার ভয় থাকে।

ততক্ষণে চুরাইলটা কাছাকাছি এসে পড়েছে। পকেট থেকে গুলি বের করতে গিয়ে তাড়াতাড়িতে টর্চটা হাত থেকে পড়ে গেল এবং নিবে গেল। এবার মনে হল অন্ধকারে ডুবে গেছি। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে গুলিগুলো ভরে ট্রিগারে চাপ দিলুম। এবার রিভলভারটা গর্জে উঠল। পরপর দুটো গুলি ছোঁড়ার পর চুরাইলের চিৎকার থেমে গেল। মারা পড়েছে ভেবে সাহসী হয়ে পা বাড়াচ্ছি, কেউ শিস দিল কোথাও। সেই সময় আমার পিছনে কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুম, "জয়ন্ত! জয়ন্ত!"

চেঁচিয়ে বললুম, "টর্চ জ্বালুন শিগগির! পেত্নিটাকে আমি গুলি করে মেরেছি।"

কর্নেলের হাসি শোনা গেল। "পেত্নিকে কখনও গুলি করে মারা যায় না ডার্লিং!"

"আঃ! টর্চ জ্বালুন না কেন?"

"তোমার টর্চ কী হল?"

"কোথায় পড়ে গেছে।"

"আমার টর্চটা কেউ খনিগুহার ভেতর কেড়ে নিয়েছে।"

কর্নেল কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললুম, "সে কী! কেড়ে নিয়েছে মানে?"

কর্নেল চুরুট ধরালেন লাইটার জ্বেলে। তারপর বললেন, "খনিটা ছিল ডলোমাইটের। ভেতরটা বেশ চওড়া। এপাশে-ওপাশেও অনেক খোঁদল আছে। করাড়িরোটি খুঁজছি, হঠাৎ কে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে আমাকে ফেলে দিল। টর্চটা ছিটকে পড়ে নিবে গেল। উঠে আর খুঁজেই পেলুম না। লাইটারের আলোয় কোনোরকমে বেরিয়ে এলুম। এসে দেখি, চুরাইলের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ চলেছে।"

আমিও সিগারেট ধরালুম। তারপর লাইটারের আলোয় কয়েক পা এগিয়ে টর্চটা খুঁজে পেলুম। টর্চের আলোয় নিরাশ হয়ে দেখলুম কোথাও গুলিবিদ্ধ চুরাইল পড়ে নেই। একফোঁটা রক্তও নেই। ভূতপেত্নিদের হয়তো রক্ত থাকার কথা নয়। গুলি তাদের গায়ে লাগারও কথা নয়। তবে আওয়াজে তারা ভয় পেতেও পারে। বললুম, "ব্যাপারটা কী হতে পারে বলুন তো কর্নেল?"

"কোন্ ব্যাপারটা?"

"চুরাইল?"

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, "নিছক পেত্নি ছাড়া কিছু নয়, সে তো বুঝতেই পারছ।"

"কিন্তু আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে ভূত-পেত্নি বলে সত্যি কিছু থাকতে পারে।"

"স্বচক্ষে দেখেও?" কর্নেল হঠাৎ গলাটা নামিয়ে বললেন, "যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এ-তল্লাটে ঘোরাঘুরি করাতে চুরাইলের ভীষণ আপত্তি আছে। তাই সে ভয় দেখাতে এসেছিল।"

চারদিকে ভয়ে-ভয়ে আলো ফেলে আমরা হাঁটছিলুম। হাতে রিভলভারও তৈরি। কর্নেলের কথার জবাবে কী বলব ভেবে পাচ্ছিলুম না।

কর্নেল টর্চের আলোয় এক টুকরো লালরঙের ছেঁড়া কাপড় দেখিয়ে বললেন, "আমাকে ধাক্কা মারতেই আমিও তাকে ধরার চেষ্টা করেছিলুম। তার পরনের কাপড়ের এই টুকরোটা আমার হাতে থেকে গেছে। তুমি বলেছিলে, সাধুবাবার পরনে লাল কাপড় দেখেছ। কাজেই সে সেই সাধু ছাড়া আর কে হতে পারে? সম্ভবত অন্য কোনো সুড়ঙ্গ দিয়ে ওখানে যাওয়া যায়। সে আমাকে ফলো করেছিল অন্য দিক থেকে।"

আমার মাথায় চমক খেলে গেল। বললুম "কর্নেল! অনেক তান্ত্রিক সাধু প্রেতসিদ্ধ হন শুনেছি। তাঁদের নাকি পোষা ভূতপ্রেত থাকে। চুরাইল বা শাঁখচুন্নিটা ওই সাধুর পোষা নয় তো?"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "তাহলে এতদিনে তুমি স্বীকার করলে যে ভূতপ্রেত সত্যি আছে?"

"কী জানি! কিন্তু আপনিও তো ওসবে বিশ্বাস করেন না!"

কর্নেল হঠাৎ গলা চড়িয়ে বললেন, "আলবাত করি। কে বলল করি না?"

তারপর ডানদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তেমনি চড়া গলায় বলে উঠলেন, "কী রুদ্রবাবু! এখানে কী করছেন—অন্ধকারে?"

টর্চের আলো সেদিকে ফেলে দেখি, যদুবাবুর ছোটভাই রুদ্রনারায়ণ একটা পাথরের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। খেঁকিয়ে উঠলেন একেবারে, "আঃ! আলো নেবান তো মশাই!"

টর্চ নিভিয়ে দিলুম। কর্নেল বললেন, "আসুন! বাড়ি যাবেন না?"

"না।"

"আহা! খামোকা বাড়ির লোকের ওপর রাগ করে আর কী হবে রুদ্রবাবু? তাছাড়া এখানে অন্ধকারে বসে থাকাও তো বিপজ্জনক। একটু আগে আপনি কি চুরাইলের ডাক শোনেননি?"

রুদ্রবাবু আরও খেঁকিয়ে উঠলেন, "যান মশাই! আপনাদের আর ভালমানুষি করতে হবে না! আমাকে চুরাইল দেখাচ্ছেন! নিজেদের মাথা বাঁচান আগে—তারপর কথা বলতে আসবেন!"

কর্নেল আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, "চলো জয়ন্ত! রুদ্রবাবু ভীষণ চটে আছেন মনে হচ্ছে।"

ওঁদের বাগানের কাছাকাছি যেতেই লণ্ঠন হাতে দশরথকে দেখা গেল। আমাদের দেখে সে আশ্বস্ত হল। তার হাতে একটা বল্লমও দেখতে পাচ্ছিলুম। বলল, "বড়বাবু আপনাদের

হাত বাড়ালেই ভূত

ভূতেরা কোথায় থাকে ?

এর উত্তরে ভূত-বিশ্বাসীরা কী বলবে বলো তো ? বরং তারা উল্টো প্রশ্ন করবে, ভূতেরা কোথায় না থাকে ? সত্যি বলতে কী, তর্ক করে এর কোনো মীমাংসা হবে না।

কিন্তু একটা কথা সক্কলে স্বীকার করবে—সে তারা ভূতে বিশ্বাসী হোক, কিংবা হোক ভূতে অবিশ্বাসী—যে, একটা জায়গায় হাত বাড়ালেই ভূতের দেখা পাওয়া যায়।

কোন্ জায়গা জানো ?

জায়গাটা হল, বইয়ের তাক।

হ্যাঁ, বইয়ের তাকেই ভূত রয়েছে। শুধু একটু কাছে ডেকে নেওয়া। তাহলেই দেখবে, কেমন সুড়সুড় করে নানা ধরনের ভূত এসে ঠিক হাজির হবে। কেউ-বা আলেয়াভূত, কেউ-বা পাখিভূত, কেউ-কেউ ব্রহ্মদত্যি। কেউ নিপাট ভালমানুষ, কেউ খুব দুষ্টু। কোনো ভূত যদি অঙ্ক কষে দেয়, কোনো ভূত খুঁজে দেয় গুপ্তধন। আর এইসব নানান ধরনের নানান চেহারার নানান চরিত্রের ভূতেরা যেসব বইতে রয়েছে সেইসব বইয়ের নামগুলো তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি।

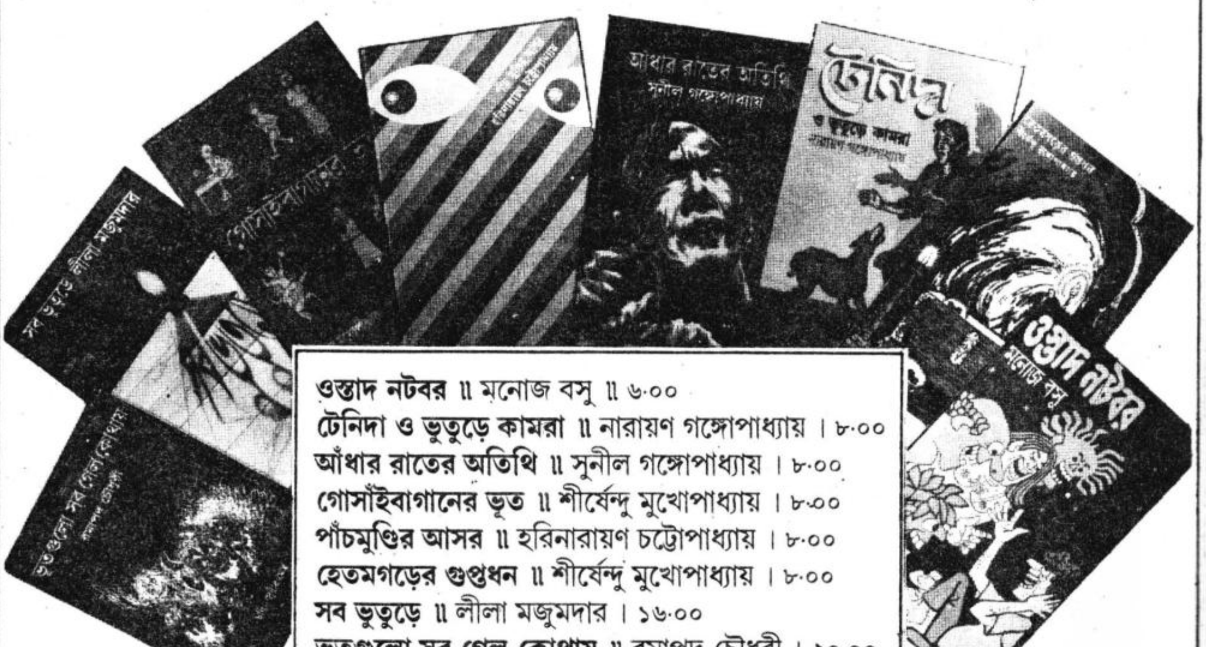

ওস্তাদ নটবর ॥ মনোজ বসু ॥ ৬·০০
টেনিদা ও ভুতুড়ে কামরা ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ৮·০০
আঁধার রাতের অতিথি ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ৮·০০
গোসাঁইবাগানের ভূত ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। ৮·০০
পাঁচমুণ্ডির আসর ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ৮·০০
হেতমগড়ের গুপ্তধন ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। ৮·০০
সব ভুতুড়ে ॥ লীলা মজুমদার। ১৬·০০
ভূতগুলো সব গেল কোথায় ॥ রমাপদ চৌধুরী। ২০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

লিয়ে বহত শোচ করছেন স্যার। পিঙ্কিদিদি বলল কি, কর্নিল স্যারদের খনির অন্দরে ঘুসতে দেখেছে। ঔর আপনারা এত্তা দেরি করলেন!"

বুঝলুম, দশরথের ইচ্ছে ছিল না আমাদের খুঁজতে যাওয়ার। কর্তাবাবুর চাপে পড়ে তাকে বেরুতে হয়েছে। সে যে ভীষণ ভিতু মানুষ, তাতে সন্দেহ নেই।

যদুবাবু অপেক্ষা করছিলেন ব্যস্তভাবে। বললেন, "খুব ভাবছিলুম কর্নেল! এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে শুনুন। মায়ের আলমারি থেকে একটা পুরনো দলিল চুরি গেছে। আপনি আমার বাবার খনির দলিল দেখতে চেয়েছিলেন। ওই দলিলটাও তার মধ্যে ছিল। মা বলছেন, এ নিশ্চয় রুদ্রের কাজ। রুদ্রের সঙ্গে এ নিয়ে আমারও একচোট হয়ে গেল। বাবু রাগ করে বেরিয়ে গেলেন।"

কর্নেল বললেন, "রুদ্রবাবুকে মাঠে বসে থাকতে দেখে এলুম।"

যদুবাবু বাঁকা মুখে বললেন, "চুরাইলের পাল্লায় পড়লেই বাছাধন টের পাবে!" তারপর দশরথকে চায়ের হুকুম দিয়ে কর্নেলের মুখোমুখি বসলেন।

কর্নেল বললেন, "ও দলিল রুদ্রবাবু কী করবেন?"

যদুবাবু চাপাগলায় বললেন, "আপনাকে বলেছিলুম। ওই দলিলটা আনরেজিস্টার্ড। নন্দলাল ওঝা নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন বাবার খনি-ব্যবসার পার্টনার। নন্দবাবু নিজের একার নামে একটা পোড়ো খনি কিনেছিলেন আরেকজনের কাছে। কেন কিনেছিলেন জানি না। পরে যখন সব খনি অ্যাবাণ্ডণ্ড হয়ে গেল, বাবার মাথায় কেন কে জানে ঝোঁক চাপল, নন্দবাবুর কেনা সেই প্রাচীন অ্যাবাণ্ডণ্ড খনিটা কিনতে চাইলেন। নন্দবাবু কিছুতেই বেচতে রাজি নন। বাবাও ছাড়বেন না। অবশেষে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম হাঁকলেন নন্দবাবু। বাবা তাই দিলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে আজও রহস্য। যাই হোক, পরদিন রেজেস্ট্রি হওয়ার কথা। রাতে হঠাৎ নন্দবাবু ভেদবমি হয়ে মারা গেলেন। দলিল আর রেজিস্ট্রি করা হল না। কিন্তু এ দলিল চুরি যে রুদ্রই করেছে, তাতে ভুল নেই। সে বরাবর মাকে ওই দলিলটা চাইত। বলত, তার দরকার আছে। কী দরকার সেই জানে। আমার সঙ্গে তো ভাল করে কথাবার্তাই বলে না।"

"নন্দবাবুর ছেলেপুলে আছে কি?"

"নন্দবাবু ছিলেন উড়নচণ্ডী স্বভাবের লোক। বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলেন। ওঁর মৃত্যুর পর সেই ভদ্রমহিলা কলকাতায় দাদার কাছে চলে যান। যতদূর জানি, তাঁর কোনো ছেলেপুলে নেই।"

"নন্দবাবুর আর কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না ভৈরবগড়ে?"

"এক পিসতুতো না মাসতুতো দাদা ছিলেন তিনি তো বছর-আষ্টেক আগে নিরুদ্দেশ।"

"কী নাম ছিল ভদ্রলোকের?"

যদুবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "পান্নাবাবু।"

কর্নেল বললেন, "সেই পোড়ো খনিটা কোথায় আপনি কি জানেন?"

যদুবাবু মাথা দোলালেন, "না। বাবার এক উদ্ভট খেয়াল ছাড়া আর কী বলব? নিজেদের সব খনি অ্যাবাণ্ডণ্ড হয়ে গেল আবার একটা অ্যাবাণ্ডণ্ড খনি কিনে বসলেন পঞ্চাশ হাজার টাকায়। কী অদ্ভুত ব্যাপার না?"

"খনিটা কোথায়, সেটা দলিলটা দেখতে পেলে জানা যেত।" কর্নেল চিন্তিতভাবে বললেন। "সমস্যা হল যে দলিলটা আন-রেজিস্টার্ড। কাজেই রেজেস্ট্রি অফিসে তার কপি মিলবে না।"

এতক্ষণে বললুম, "পোড়োখনির ভেতর কোনো দামি জিনিস—ধরুন গুপ্তধন লুকোনো ছিল না তো?"

যদুবাবু নড়ে বসলেন। "ঠিক, ঠিক! কী আশ্চর্য! এ-কথাটা তো আমার মাথায় আসেনি! আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন জয়ন্তবাবু! ইশ্, কেন যে দলিল থেকে ওই পোড়োখনির সীমানা-চৌহদ্দি টুকে রাখিনি!"

দশরথ চা এনে দিল। তারপর গাল চুলকে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "করাড়ি রোটি মিলা হ্যায় স্যার?"

কর্নেল প্যান্টের পকেট থেকে সত্যি সত্যি এক টুকরো করাড়ি রোটি বের করে ওকে দিলেন। দশরথ সেটা ভক্তিভরে দুহাতে নিয়ে মাথায় ঠেকাল। তারপর খুশি হয়ে বেরিয়ে গেল। যদুবাবু বললেন, "এখানকার লোকের এই এক অদ্ভুত বিশ্বাস! ওই কুৎসিত পদার্থটা খেলে নাকি বুড়োরাও যুবকের শক্তি ফিরে পায়। তবে দশরথ করাড়ি রোটি খেলে কী হবে? গাঁজা খায় যে! গাঁজা ওটার সব গুণ নষ্ট করে দেবে।"

দশরথ বাইরে থেকে প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল, "রামজির কিরিয়া বড়বাবু! হামি কভি গাঁজা পিই না!"

যদুবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "খাস না! তাই রাতে ডাকলে তোর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না!"

একটু পরে চা খেতে খেতে বললুম, "কর্নেল, নন্দবাবুর সেই পোড়োখনিটাতে গুপ্তধন থাকার ব্যাপারে আপনার কী মতামত, এখনও বলেননি কিন্তু!"

কর্নেল কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন, সেই সময় বাইরে পায়ের ধুপধাপ শব্দ শোনা গেল। তারপর কেউ দৌড়ে বারান্দায় উঠল। যদুবাবু বললেন, "কে? কে?" বাইরের লোকটা সশব্দে আছাড় খেল যেন। কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন এই সময় দশরথের চাপা আর্তনাদ শোনা গেল. "হায় রাম এত্তা খুন!"

বাইরের আলোটা মিটমিটে। আমরা হন্তদন্ত বেরিয়ে দেখি বারান্দায় রুদ্রবাবু পড়ে আছেন। তাঁর গলার কাছে ক্ষতচিহ্ন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। যদুবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "রুদ্র! রুদ্র! কে তোর এ দশা করল রে?" তারপর হাঁউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন ছেলেমানুষের মতো।

কর্নেল রুদ্রবাবুর দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন. "রুদ্রবাবু কে আপনাকে মেরেছে?"

রুদ্রবাবু অতিকষ্টে বললেন, "বিশ্বাসঘাতক!" তারপর তাঁর শরীর স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে স্থির হয়ে গেল। বুঝলুম, বেচারার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। আর ঠিক তখনই বাগানের গাছপালার ওদিকে কোথাও সেই চুরাইলের ডাক শোনা গেল···আঁ—আঁ—আঁ—ইঁ—ইঁ—ইঁক্!

একটা প্রচণ্ড বিভীষিকার রক্ত-হিম-করা আতঙ্ক আমাদের কয়েক মুহূর্তের জন্য নিঃসাড় করে ফেলল

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ছবি এঁকেছে **পারমিতা ভদ্র** (বয়স ৬)

ডাকাতি

বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে মৎস্যকন্যা নামে একটি ভারতীয় জাহাজ মাদ্রাজ বন্দরের অদূরে এসে নোঙর করল। সেখানে অনেক জাহাজ ছিল বলে সে একটু দূরেই নোঙর ফেলেছিল।

রাত তখন প্রায় শেষ। জাহাজের ছোট-বড় সবাই খুব খুশি—তারা অনেকদিন জলে কাটিয়েছে, এবার ডাঙায় নামবে। জাহাজের প্রায় সবাই ঘুমোচ্ছে। কয়েকজন অফিসার নিজের কাজে ব্যস্ত।

একজন অফিসার নিজের কেবিনের দরজা বন্ধ না করেই ঘুমোচ্ছিলেন। এমন সময় কয়েকজন লোক লঞ্চে করে এসে নাইলনের মই লাগিয়ে চুপিচুপি জাহাজে উঠল। উঠে তারা এদিক-ওদিক দেখে খোলা কেবিনটিতে ঢুকে পড়ল। শব্দে অফিসারের ঘুম ভেঙে গেলে তারা ছোরা দেখিয়ে অফিসারের সব জিনিসপত্র কেড়ে নিল।

সব নিয়ে তারা যখন পালাচ্ছে, তখন ওই অফিসারের ডাকাডাকিতে সকলে উঠে পড়ল। একজন এর মধ্যে ওয়ারলেসে জলপুলিশকে খবর দিল। জলপুলিশের লঞ্চ নিকটেই ছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা এসে পড়লেন। দুজন ধরা পড়ল। বাকিরা পালিয়ে গেল।

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, ডাকাতদের যে সর্দার তার দুটি হাত ও একটি পা ছিল না।

কল্লন ঘোষ (বয়স ১২)

বুবাইয়ের স্কুলে যাওয়া

বুবাইকে তোমরা কেউ চেনো না। আমিও চিনি না দিদির কাছেই বুবাইয়ের গল্প শুনেছি।

ছোট্ট বুবাই সবে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। কিন্তু স্কুলে যাওয়ার নামে রাজ্যের বিরক্তি। রোজই চিৎকার, কান্নাকাটি।

একদিনের ঘটনা, কাকু বুবাইকে স্কুলে দিতে যাচ্ছেন। মাঝরাস্তায় হঠাৎই বসে পড়ল ও—"কাকুগো, দোহাই তোমার, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো, আমি স্কুলে যাব না।"

আরেকদিন আর এক কাণ্ড। মা ওকে স্কুলে দিতে গেছেন, আর বুবাই কাঁদছে। স্কুলের দোরগোড়ায় পৌঁছবার পরে হঠাৎ কানফাটানো আর্তনাদ—"কে কোথায় আছ বাঁচাও।" আশপাশের লোকেরা মায়ের দিকে তাকাচ্ছে, যেন মা একজন ছেলেধরা।

এত বিপত্তির পর সুখবরটা এই—বুবাই এখন হাসিমুখে রোজ স্কুলে যাচ্ছে।

লিপিকা বর্মণ (বয়স ১৪)

ছবি এঁকেছে **অর্ক পাল** (বয়স ৬)

রিয়া...

...সতেজ সুন্দর অনুভূতি!

ফুল রিয়া	লেবু রিয়া
কোমল ও মৃদু !	শীতল ও তরতাজা করা !
সৌখিন গোলাপী সাবান	চন্‌মনে সবুজ সাবান
ফুলের হাল্‌কা সৌরভে !	লেবুর লোভনীয় সৌরভে !

রিয়া সুরভিত সাবান

টাটার তৈরী

CASTR 8-223 BEN

বেগমের বরাদ্দ পাঁচ টাকা

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

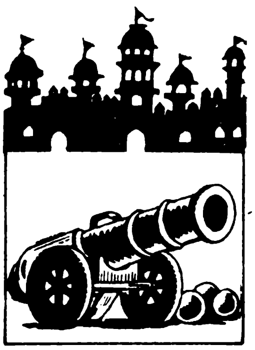

সিপাহি-বিদ্রোহের প্রায় পঁচিশ বছর পরে, ১৮৮১ সালে, ভারত সরকার একটি আবেদনপত্র পেলেন। আবেদন করেছেন শাহজাদা ফিরোজ শাহর বিধবা। মক্কা শহরে তাঁর স্বামী শাহজাদা ফিরোজ শাহর মৃত্যু হয়েছে। তিনি সরকারের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছেন। ফিরোজ শাহর নাম খুব বেশি লোকের কাছে পরিচিত নয়। দিল্লির সম্রাট-বংশে তাঁর জন্ম। ঔরঙ্গজেবের পুত্র, যিনি প্রথম বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন, ফিরোজ শাহ তাঁর বংশের সন্তান। হয়তো সিংহাসনে বসতে পারতেন, কিন্তু তাহলে বোধহয় এতদিন বেঁচে থাকতেন না। প্রথম বাহাদুর শাহর মৃত্যুর পরে দিল্লির সিংহাসন নিয়ে নানারকম রাজনৈতিক খেলা চলছিল। ফিরোজ শাহর বাবার নাম আমরা জানি, নিজাম বখ্‌ত। যে কর্মচারীর হাতে এই দরখাস্তটি পড়েছিল, তিনি নিশ্চয়ই এত খবর জানতেন না, তাই দরখাস্তের উপর লিখে দিলেন, মাসিক পাঁচটাকা মঞ্জুর। এই দেশ যখন ক্রমশ ইংরেজদের অধিকারে আসে, তখন তারা আগেকার রাজাদের বৃত্তি দিতে কৃপণতা করেনি। দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়া তো বছরে আট লাখ টাকা বৃত্তি পেতেন। অনেকে তখন মনে করেছিলেন যে, বেশি দেওয়া হচ্ছে, এর চেয়ে কম দেওয়া উচিত। ইংরেজের কাছে হাজার টাকার বেশি বৃত্তি পেতেন এরকম রাজা কিংবা নবাব সংখ্যায় কম ছিলেন না। তখনকার দিনে সামান্য সিপাহিদের মাইনেও ছ'সাত টাকার কম হত না। কর্মচারীটি সম্ভবত এসব কথা ভেবে দেখেননি। যা হোক, লর্ড রিপন যখন বড়লাট হয়ে এলেন তখন তিনি এই ভুল খানিকটা সংশোধন করেছিলেন। তিনি ফিরোজ শাহর বেগমকে ভাতা বাড়িয়ে মাসিক একশো টাকা করেছিলেন, দরখাস্তের সময় থেকেই এই হারে দেওয়া হবে।

কাউকে দোষ দেওয়া উচিত হবে না। ইতিহাসে শাহজাদা ফিরোজ শাহ প্রায় অজ্ঞাত পুরুষ। কোনো কোনো ইতিহাসে তাঁর নামের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁর ছবি কখনও স্পষ্ট হয়নি। সিপাহি-যুদ্ধের কিছুদিন আগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তর ভারতে বেড়াতে গিয়েছিলেন, যেমন তিনি মাঝে-মাঝে যেতেন। দিল্লিতে যমুনা নদী দিয়ে নৌকোয় যেতে-যেতে দেখলেন, লালকেল্লার পিছন দিকে প্রাসাদের ছাতে বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন। বাদশাহর ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে কিছু ভিড় জমেছিল। মহর্ষির আত্মজীবনী পড়লে মনে হয় যে, ঘটনাটি তাঁর কাছে একটু আশ্চর্য মনে হয়েছিল, কিন্তু তিনি এ-কথাও ভেবেছিলেন যে, তাতে ক্ষতি কী? বাদশা তো তখন ইংরেজদের হাতের পুতুল। ঘুড়ি ওড়ানো ছাড়া তাঁর আর কী কাজ থাকতে পারে? আসল কথা, ঘটনার স্রোত কোন্‌দিকে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে কারুর কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

১৮৫৭ সালের মে মাসে সিপাহি-যুদ্ধ যখন আরম্ভ হল, ফিরোজ শাহ তখন মক্কায় তীর্থ করছিলেন। বোম্বাই এসে সে-কথা শুনলেন। মিরাট থেকে একদল সিপাহি বিদ্রোহ করে দিল্লি এসে পৌঁছল। সম্রাট বাহাদুর শাহকে জানানো হল, ইংরেজদের বিরুদ্ধে তামাম হিন্দুস্থান লড়াই করবে, সম্রাট তাদের নেতা হবেন। বাহাদুর শাহ এমন বিপদে আর কখনও পড়েননি। কবিতা লিখে, পাখি পুষে, ঘুড়ি উড়িয়ে তাঁর দিন কেটেছে। তিনি কিছু বুঝতে না পেরে, যে ইংরেজ কর্মচারী তাঁর সঙ্গে থাকতেন তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসামাত্র সিপাহিদের হাতে খুন হয়ে গেলেন। এক বছরেরও বেশি পরে দিল্লি আবার ইংরেজদের হাতে এল। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে বন্দী করে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাঁর কয়েকজন ছেলেকে হাডসন সাহেব বন্দী করে নিয়ে আসছিলেন, রাস্তায় গাড়ি থেকে নামিয়ে তাদের খুন করলেন।

ফিরোজ শাহ ইতিমধ্যে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি সীতামৌ আক্রমণ করলেন। সেখান থেকে মান্দাসোর। মান্দাসোরে গিয়ে তিনি প্রচার করে দিলেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি ধর্মযুদ্ধ শুরু করেছেন, একজন প্রধানমন্ত্রীও বহাল করলেন। সিপাহিরা তাঁর চারদিকে এসে জড়ো হতে লাগল। ফিরোজ শাহ ভাবলেন, এবার তাঁকে সিপাহিদের একজন প্রধান নেতা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তিনি চারপাশের কোনো কোনো রাজা বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে চিঠি লিখলেন এই আশায় যে, তাঁরা তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দেবেন। তখন তাঁর সৈন্যসংখ্যা অন্তত সতেরো-আঠারো হাজার হয়েছিল। কিন্তু এ-অবস্থা বেশিদিন থাকল না। স্যার হেনরি ডুরাণ্ডের কাছে পরাজিত হবার পর দ্রুত পতন হতে লাগল। দলের লোকেরা তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে লাগল। কিছুদিন তিনি মধ্যপ্রদেশের এক জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈন্যের তাড়া খেয়ে সে-আশ্রয়ও তাঁকে ছাড়তে হয়। ফিরোজ শাহর সেনাবাহিনীর অতি অল্পই অবশিষ্ট ছিল। ফিরোজ শাহ ও তাঁর দুই বন্ধু পাণ্ডুরঙ্গ সদাশিব রাওসাহেব ও তাঁতিয়া টোপি, এই তিনজনের সৈন্যসংখ্যা মিলিয়ে দু'হাজার হবে কিনা সন্দেহ। অবস্থা এরকম দাঁড়াল যে, তাঁরা আর একসঙ্গে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না। একসঙ্গে থাকলে ইংরেজের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি, কাজেই তাঁরা যে-যার সৈন্য নিয়ে আলাদা হয়ে গেলেন। তাতেও সুবিধা হল না। তাঁতিয়া টোপিকে তাঁর বন্ধু মান সিং বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দিলেন। রাওসাহেবও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁরও সেই পরিণতি হল। কিছুদিন আগে মহারানি ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল, যাঁরা ইংরেজদের রক্তপাত করেননি, তাঁদের প্রাণের ভয় নেই। তাঁতিয়া টোপি ও রাওসাহেব দু'জনেই বলেছিলেন যে,

ইংরেজদের হত্যার জন্য তাঁরা কেউই দায়ী নন। ইংরেজেরা একথা বিশ্বাস করেননি। তাঁতিয়া টোপি ও রাওসাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার লোকের অভাব হয়নি। ফিরোজ শাহর মনে হল, তাঁর পক্ষে দেশ ছেড়ে যাওয়াই মঙ্গল। ইংরেজেরা বলেছিলেন যে, ফিরোজ শাহকে যদি শাস্তি দেওয়া নাও হয় তাহলেও তাঁকে নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে দেওয়া হবে না। ইংরেজ সরকার ঠিক করে দেবেন তিনি কোথায় থাকবেন। ফিরোজ শাহ এই শর্তে রাজি হলেন না। বিদ্রোহের সূত্রপাতে যেমন হঠাৎ আরব দেশ থেকে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেইরকম একদিন আবার ভারতবর্ষ ছেড়ে আরব দেশে চলে গেলেন। যাবার আগে তিনি তাঁর এক কর্মচারীকে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর ভাষা এমন যে, পড়লে মনে হয় তিনি যেন দিল্লির বাদশা। ইংরেজদের ধারণা হয়েছিল, এমন দুর্বিনীত লোকের সঙ্গে আলোচনায় ফল হবে না।

এর পরে ফিরোজ শাহ সম্বন্ধে নানারকম খবর রটতে লাগল। ১৮৬০ সালে শোনা গেল, ফিরোজ শাহকে কান্দাহারে দেখা গিয়েছে। পরের বছর বোখারোতে। আবার কয়েক বছর পরে কাবুলে। তখন সিপাহি-বিদ্রোহের উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। ফিরোজ শাহ তাঁর রাজ্যে বাস করবেন এটা কাবুলের আমির ভাল চোখে দেখেননি। ১৮৭২ সালে ফিরোজ শাহকে কনস্টেনটিনোপ্‌লে (এখন ইস্তাম্বুল) দেখা গিয়েছিল। নানা সময়ে নানা দেশ থেকে তাঁর সম্বন্ধে খবর আসতে লাগল। সব খবরই যে সত্যি, তা নাও হতে পারে।

সরকারি কাগজপত্র ঘাঁটলে দেখা যাবে, কিছু ভারতীয় তখন দেশ ছেড়ে আরবের বিভিন্ন শহরে কিংবা তুর্কি দেশে বসতি করতেন। তার মধ্যে বেশিরভাগই সিপাহি-যুদ্ধের সময় দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা সাধারণ মানুষ, খুব যে বড় চাকরি বা ব্যবসা করতেন, তা নয়। একজন ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর ডাক্তার। তিনি এদেশে এসে হাকিমি ব্যবসা করতেন। একজনের ছিল সোনারুপোর গয়নার দোকান। আর একজন চিনদেশ থেকে আমদানি করা জিনিসের ব্যবসা করতেন। কেউ কেউ সাধারণ ফেরিওয়ালা। একজন নিজেকে বলতেন 'পির'। তিনি মাদুলি বেচতেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল, এই মাদুলিতে খুব কাজ হয়। এঁরা অনেকে ফিরোজ শাহকে নেতা বলে মানতেন। একজন ইংরেজ কর্মচারী ১৮৭৫ সালে লিখেছেন যে, তাঁর বিশ্বাসী এক লোক ফিরোজ শাহকে দেখেছেন। তাঁর মতে ফিরোজ শাহ কিছুকাল ইস্তাম্বুলে থাকার পর মক্কা চলে গিয়েছেন। তখন ফিরোজ শাহর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। এক চোখে ভাল দেখতে পান না, একটু খুঁড়িয়ে চলতে হত। সম্ভবত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে ও পথক্লেশে তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল। তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশের নীচে। যতদিন ফিরোজ শাহ বেঁচে ছিলেন, ইংরেজরা তাঁর উপর নজর রেখেছিল। খবর আছে, ফিরোজ শাহর ইচ্ছা ছিল যে, পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান রাজ্যগুলিকে এক করে আবার ইংরেজদের সঙ্গে লড়বেন। দিল্লির বাদশাহি তাঁর কাছে আবার ফিরে আসবে।

ফিরোজ শাহর শেষের জীবন খুব কষ্টে কেটেছিল, প্রায় ভিখিরি হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাদশাহির স্বপ্ন তিনি ছাড়তে পারেননি। কী করে তাঁর দিন চলত, ইংরেজরা সে-খবরও বের করেছিলেন। আবদার রহমান নামে এক ভারতীয় মুসলমানের

মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন ফিরোজ শাহ। শ্বশুরের সঙ্গেই থাকতেন। হতাশা ও দুঃখকষ্টের মধ্যে ফিরোজ শাহর মৃত্যু হল। মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা ভারত সরকারের কাছে কিন্তু অর্থসাহায্য চেয়ে আবেদন করেছিলেন। তার ফল কী হয়েছিল সেকথা প্রথমেই বলেছি।

ছবি : অনুপ রায়

বোহেমিয়ায় কেলেঙ্কারি

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : ওয়াটসন তাঁর বন্ধু হোম্‌সের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তার একটু পরেই হোমসের সঙ্গে দেখা করতে এলেন বোহেমিয়ার রাজা। অত্যন্ত ব্যক্তিগত কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করার কাজে তিনি হোম্‌সকে নিয়োগ করতে চান। সমস্যা হল, তিনদিনের মধ্যে সেই কাগজপত্র উদ্ধার করতে না পারলে বোহেমিয়ার রাজ-পরিবারের সুনাম নষ্ট হবে। তিনবার বিভিন্ন উপায়ে সেই কাগজপত্র উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক প্রচেষ্টাই হয়েছে ব্যর্থ।...

॥ ৩ ॥

কাঁটায়-কাঁটায় তিনটের সময় আমি বেকার স্ট্রিটে গিয়ে হাজির হলুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি শার্লক হোমস বাড়ি নেই। ল্যাণ্ডলেডি আমাকে বললেন যে, হোমস সকালে আটটার কিছু পরেই বেরিয়ে গেছে। হোমস যতক্ষণ না ফেরে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জেনে চেয়ারটা ফায়ারপ্লেসের কাছে সরিয়ে এনে আমি আরাম করে বসলুম। যদিও আগেকার দু'একটা রহস্যের তুলনায় বর্তমান তদন্তে রোমহর্ষক ব্যাপার কিছু নেই, তবুও এই সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিটির সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক খ্যাতির জন্য আমি এই সমস্যাটার সম্বন্ধে মনে-মনে বিশেষ কৌতূহল অনুভব করছিলুম। তা ছাড়া, হোমসের অনুসন্ধানের পদ্ধতি, যে-কোনো অবস্থার মোকাবিলা করবার ক্ষমতা, এলোমেলো বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে থেকে আসল সত্যটা চট করে বুঝে নেওয়ার শক্তি আমাকে মুগ্ধ করে। অজস্রবার হোমসকে সকল রকম রহস্যের সফল সমাধান করতে দেখে আমি তার সাফল্য সম্বন্ধে এতই নিশ্চিত যে, সে যে কখনও ব্যর্থ হতে পারে, এমন চিন্তা আমার মাথাতেই আসত না।

চারটের একটু আগে একজন সহিস ধরনের লোক ঘরে ঢুকল। যদিও আমি আমার বন্ধুর ছদ্মবেশ ধারণের অসাধারণ ক্ষমতার কথা জানি তবুও এই একমুখ দাড়ি-গোঁফওলা ময়লা জামাকাপড়-পরা অপরিষ্কার লোকটি তিন-তিনবার দেখবার পরে তবেই আমি বুঝলুম যে এ শার্লক হোমসই বটে। আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকে হেসে হোমস নিজের ঘরে ঢুকে গেল। পাঁচ মিনিট পরেই বেশ পরিবর্তন করে সে বেরিয়ে এল। তারপর ফায়ারপ্লেসের সামনে একটা চেয়ারে বসে পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাসতে লাগল।

"ওহ্ কী কাণ্ড!" বলেই হোমস ফের এমন হাসতে শুরু করলে যে হাসির চোটে তার দম বন্ধ হবার জোগাড়।

"হঠাৎ এত হাসির কী ঘটল?"

"সাংঘাতিক কাণ্ড! আমি সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কী কী করেছি তা তুমি কোনো মতেই কল্পনা করতে পারবে না।"

"আমার মনে হচ্ছে যে তুমি সারাদিন আইরিন অ্যাডলারের বাড়ির চারপাশে সূত্রের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করেছ।"

"ঠিক তাই। কিন্তু শেষকালে যা হল তা ভাবাই যায় না। যাই হোক, বলছি শোনো। আটটার একটু পরেই আমি বেকার সহিসের ছদ্মবেশ নিয়ে তো বেরিয়ে পড়লুম। সহিস গাড়োয়ান বা ঐ ধরনের লোকদের মধ্যে যে কি প্রচণ্ড ভাব-ভালবাসা আছে তা তুমি জানো না। যদি তুমি ওদেরই একজন হয়ে ওদের দলে ভিড়ে যেতে পারো তো যে-কোনো রকম খবর তুমি অনায়াসে পেয়ে যাবে। আমি তো 'ব্রিওনি লজ' খুঁজে বের করলুম। সুন্দর ছোট্ট দোতলা বাড়ি। বাড়ির পেছনে বাগান। দরজায় 'চাবলক' লাগানো। ঘরগুলো বেশ সাজানো গোছানো। বিরাট বিরাট প্রায় মেজে পর্যন্ত জানলা। জানলাগুলো ছিটকিনি দিয়ে আটকানো। তবে ছিটকিনিগুলো এমনই যে, যে-কোনো শিশুই সেগুলো খুলে ফেলতে পারে। বাড়ির পেছনে 'কোচহাউস'। কোচহাউসের ছাত থেকে বাড়ির ঢাকা বারান্দার জানলাটা ধরা যায়। বাড়িটার চারদিক খুব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেও আর কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি।

"তারপর আমি ঐখানেই ঘুরঘুর করতে লাগলুম। ঘুরতে ঘুরতে দেখলুম যে, বাগানের একদিকের দেওয়ালের সঙ্গে লাগোয়া এক সারি আস্তাবল। আমি সেই আস্তাবলের লোকেদের সঙ্গে জুটে গিয়ে ঘোড়াগুলোকে দলাই-মলাই করতে লাগলুম। তার বদলে কী পেলুম জানো? পেলুম দুটো পেন্স, এক গ্লাস পানীয়, বেশ খানিকটা তামাক আর অ্যাডলার সম্বন্ধে যাবতীয় খবর। উপরন্তু ঐ অঞ্চলের অন্য লোকেদের হাঁড়ির খবর আমাকে শুনতে হল।"

"অ্যাডলার সম্বন্ধে কী জানতে পারলে শুনি?"

"সার্পেন্টাইন মিউজের সবাই একবাক্যে তাঁর প্রশংসা করলে। ঠাণ্ডা প্রকৃতির চমৎকার ভদ্রমহিলা। চুপচাপ থাকেন। মাঝে মাঝে জলসায় গান করেন। রোজ ঘড়ি ধরে বিকেল পাঁচটায় বেড়াতে যান, ফেরেন ঠিক সাতটায় ডিনারের আগে। জলসা না থাকলে অন্য সময় কখনো বাড়ি থেকে বের হন না। গডফ্রে নর্টন নামে ইনার টেম্পলের এক আইনজীবী রোজ অন্তত একবার তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ভদ্রলোক নাকি অত্যন্ত সুপুরুষ। দেখ, এই হচ্ছে কোচোয়ান সহিসদের সঙ্গে ভাব জমাবার ফল। ওরা নর্টনকে বহুবার তাঁর বাসায় পৌঁছে দিয়েছে। ওদের অজানা খুব কম জিনিসই আছে। ওদের কাছ থেকে যতটা খবর পাওয়া গেল তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমি আবার ব্রিওনি লজের দিকে পা বাড়ালুম। কীভাবে কোন্ দিক দিয়ে এগোনো যায় তাই ভাবছি।

"এই গডফ্রে নর্টন ব্যক্তিটি হাজির হয়ে পরিস্থিতি ঘোরালো

আপনার ব্যাটারির খোপে ভরে দেওয়া দরকারী জাপানের সবার সেরা কারিগরী

ভরে দিন নিপ্পো

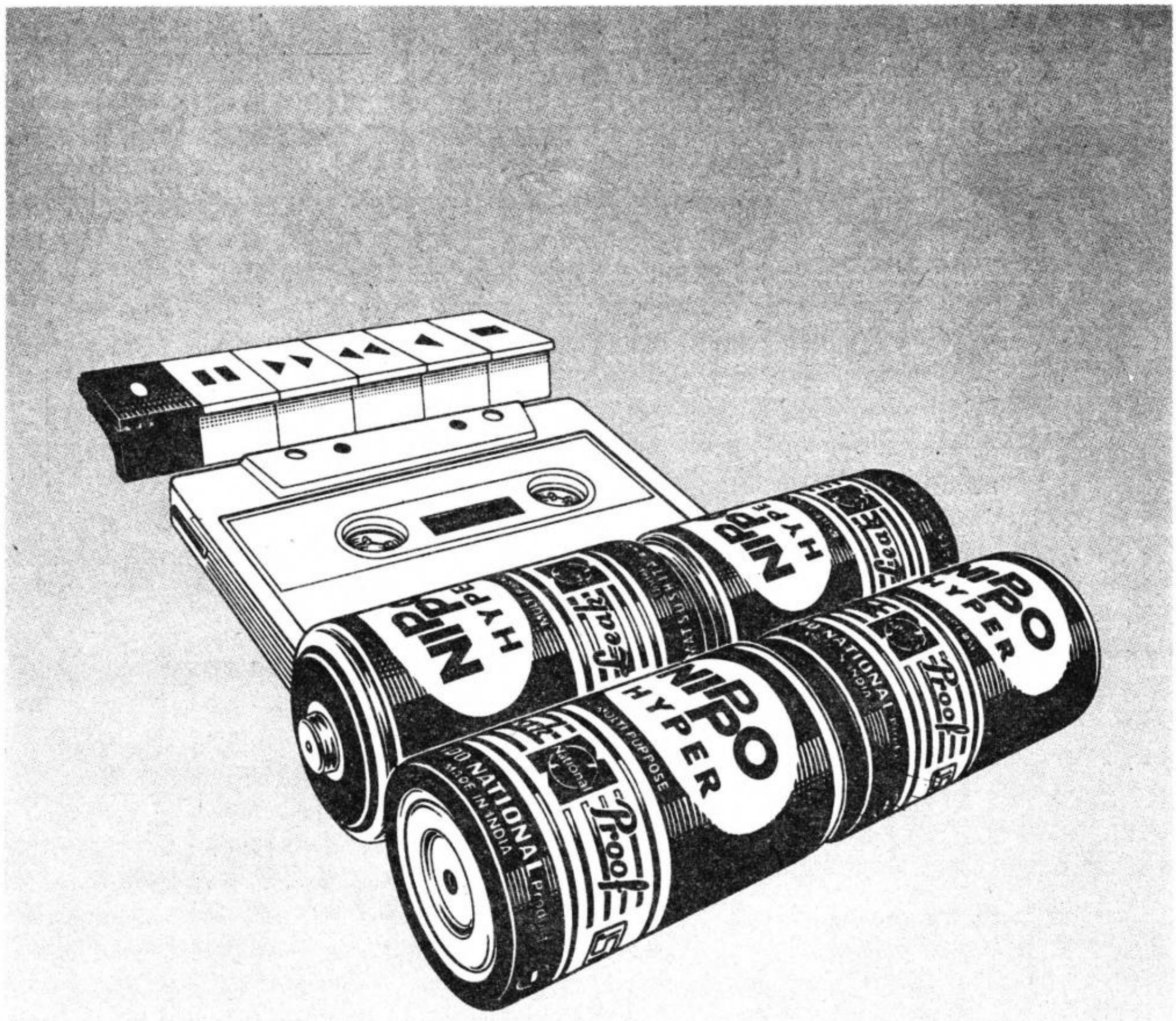

খাস জাপানের নামজাদা "ন্যাশনাল" মানেই বিশ্বের পয়লা নম্বর কারিগরী. তারাই বানায় নিপ্পো ব্যাটারি। আপনার কেনবার পক্ষে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ড্রাই সেল হল এগুলিই— আপনি নিশ্চয় আপনার নামী দামী সরঞ্জামগুলিতে যে কোন অন্য ব্যাটারি ব্যবহার করতে ভরসাই পাবেন না ?

- উপরে সীলবন্ধ থাকাই গ্যারাণ্টি দেয় এ ফ্যাক্টরি থেকে সদ্য বেরনো টাট্‌কা শক্তি
- আই এস আই মার্কা আপনাকে দেয় সেরা গুণমানের প্রতিশ্রুতি
- ধাতু দিয়ে মোড়া বলে লীক করার ভয় থেকে পুরোপুরি সুরক্ষা
- প্রত্যেকটি ব্যাটারি আপনার হাতে পৌঁছয় খুঁটিয়ে পরীক্ষার পর

নির্ভরযোগ্য শক্তির সম্পূর্ণ সম্ভার

- নিপ্পো হাই-টপ • নিপ্পো সুপার
- নিপ্পো হাইপার • নিপ্পো স্পেশাল
- নিপ্পো পেনলাইট

National **নিপ্পো**

ব্যাটারি

টেকনিক যার খাস জাপানের ন্যাশনাল হতে আর এর শক্তিশালী ব্যাটারি তৈরি হয় ভারতে

everest/84/INL/138-bn.

করে তুললে। লোকটা পেশায় আইনজীবী। আমার প্রথম সমস্যা হল অ্যাডলারের সঙ্গে এর কী সূত্রে আলাপ সেটা জানা। নর্টন যদি অ্যাডলারের আত্মীয় বা বন্ধু হয় তো এক কথা; কিন্তু যদি অ্যাডলারের আইন বিষয়ের পরামর্শদাতা হয় তো খুব মুশকিল। নর্টন যদি অ্যাডলারের আত্মীয় বা বন্ধু হয় তো অ্যাডলার তাকে তার বিশেষ মূল্যবান বা গোপন পত্র দেখাবে না বা তার কাছে রাখতে দেবে না। কিন্তু সে যদি নর্টনের মক্কেল হয়? তাহলে তো অ্যাডলার তার গোপন ও মূল্যবান কাগজপত্র তাকে দেখাবে এবং চাই কি তার হেফাজতে রাখতেও দিতে পারে। বিশেষ করে যখন তার বাড়িতে বার-দুয়েক চুরি হয়েছে, তার মালপত্র খোয়া গেছে বা অন্য জায়গায় চলে গেছে এবং তাকে দু-দুবার ছিনতাইকারীর হাতে পড়তে হয়েছে। তা যদি হয় তাহলে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটা অনেক বেড়ে গেল। এখন সমস্যা হল কোথা থেকে শুরু করি, 'ব্রিওনি লজ' না 'ইনার টেম্পল'?

"এইরকম সাত-পাঁচ ভাবছি এমন সময় একটা গাড়ি এসে থামল ব্রিওনি লজের সামনে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলেন এক ভদ্রলোক। তাঁকে এক লহমায় যা দেখলুম তাতে বুঝলুম ভদ্রলোক অসাধারণ সুপুরুষ। কোচোয়ানকে অপেক্ষা করতে বলে ভদ্রলোক দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে যে পরিচারিকাটি দরজা খুলতে এসেছিল তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। আমি বুঝলুম ইনিই সেই গডফ্রে নর্টন।

"ভদ্রলোক প্রায় আধ ঘণ্টা বাড়ির ভেতরে ছিলেন। আমি রাস্তা থেকে দেখতে পাচ্ছিলুম যে তিনি ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন আর মাঝে মাঝে খুব হাত-পা নেড়ে কথা বলছেন। অ্যাডলারকে অবশ্য আমি দেখতে পাইনি। তারপর ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চেপে কোচোয়ানকে বললেন, 'প্রথমে রিজেন্ট স্ট্রিটে গ্রস অ্যাণ্ড হ্যাংকি'র ওখানে যাব তারপর যাব এজোয়্যার স্ট্রিটে সেণ্ট মনিকার গির্জেতে। কুড়ি মিনিটে নিয়ে যেতে পারলে আধ গিনি পাবে। চালাও জোরে।'

"ভদ্রলোক চলে যাবার পর কী করব ভাবছি এমন সময় একটা ল্যাণ্ডো এসে হাজির হল ব্রিওনি লজের সামনে। দেখলুম বেচারা কোচোয়ান তখন তার পোশাকের সব বোতামগুলো পর্যন্ত আটকাতে পারেনি। বুঝলুম হঠাৎ গাড়ির মালিকের বের হবার প্রয়োজন হয়েছে তাই তাকে পড়ি-মরি করে গাড়ি এনে হাজির করতে হয়েছে। গাড়িটা এসে থামতেই একরকম প্রায় ছুটে এসে অ্যাডলার গাড়িতে উঠলেন। 'জন, সেণ্ট মনিকার গির্জে চলো। কুড়ি মিনিটে পৌঁছে দিতে পারলে আধ 'সভরেন' বকশিশ পাবে।'

"বুঝলে ওয়াটসন, এরকম সুযোগ কখনো ছাড়া উচিত নয়। অথচ কী করে ওদের ধাওয়া করা যায়? একবার ভাবলুম ল্যাণ্ডোর পেছনে উঠে পড়ি। এমন সময় দেখি একটা ভাড়াটে গাড়ি আসছে। আমি সেই চলন্ত গাড়িতে লাফ দিয়ে উঠে গাড়োয়ানকে বললুম, শিগগির সেণ্ট মনিকার গির্জে চলো। কুড়ি মিনিটে পৌঁছে দিলে আধ 'সভরেন' পাবে।

"আমার গাড়োয়ান তো খুব জোরে ঘোড়া ছোটাল। আমি তো মনে করতে পারছি না যে এত স্পিডে এর আগে আমি কখনো গাড়ি চড়েছি কিনা। যাক, আমি যখন গির্জেতে পৌঁছলুম আগের দুটো গাড়িই তখন সেখানে পৌঁছে গেছে। আমি তো ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গির্জের ভিতরে গেলুম। ঢুকে দেখি যাদের অনুসরণ করে এসেছি তারা আর একজন পাদ্রি তিনজন দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। বেকার লোক যেমন স্রেফ সময় কাটাবার জন্যে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায় আমিও সেইরকম এদিকে -ওদিকে তাকাতে-তাকাতে গির্জের মধ্যে ঘুরতে লাগলুম।

"হঠাৎ নর্টন আমাকে দেখতে পেয়ে আমার দিকে দৌড়ে এসে বললে, 'ওহ্, ভগবান রক্ষে করেছেন। ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। তোমাকে দিয়েই আমাদের কাজ হবে।' তারপর আমি কিছু বলবার আগেই আমাকে ধরে নিয়ে গেল পাদ্রির কাছে। তারপর? তারপর আমার উপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত গডফ্রে নর্টনের সঙ্গে শ্রীমতী আইরিন অ্যাডলারের শুভ বিবাহ হয়ে গেল।

বৈদ্যনাথ

আয়ুর্বেদিক টুথপাউডার (লাল)

দাঁতের পরিচর্যায়
বেছে নিন প্রকৃতির উপহার
ব্যবহার করুন

কেন আপনি *বৈদ্যনাথ* আয়ুর্বেদিক টুথপাউডার ব্যবহার করবেন ?

কারণ বেশিরভাগ টুথপেস্ট ও টুথপাউডার শুধুমাত্র আপনার দাঁত পরিষ্কার করে, কিন্তু *বৈদ্যনাথ* টুথপাউডার দাঁত পরিষ্কার তো করেই, অধিকন্তু দাঁতকে রোগমুক্ত ও রক্ষা করে। এতে আছে কয়েকটি বিশিষ্ট ভেষজ উপাদানের এক উৎকৃষ্ট সমন্বয়—যা দাঁত ও মাড়ির রোগজীবাণুকে নির্মূল করে।

বৈদ্যনাথ টুথপাউডার নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ একেবারে দূর করে। কারণ দুর্গন্ধের মূল কারণগুলি এই উৎকৃষ্ট টুথপাউডার ব্যবহারে সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হয়। কিন্তু পাশাপাশি অন্যান্য টুথপেস্ট ও টুথপাউডারগুলি একটি কৃত্রিম গন্ধের সাহায্যে সাময়িকভাবে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ কমায়।

বৈদ্যনাথ পাঁচটি আধুনিক কারখানায় সাতশ'টি আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি করেন।

আয়ুর্বেদিক টুথপাউডার (লাল)
মাড়ির রক্তক্ষরণ ও দন্তক্ষয় রোধ করে।

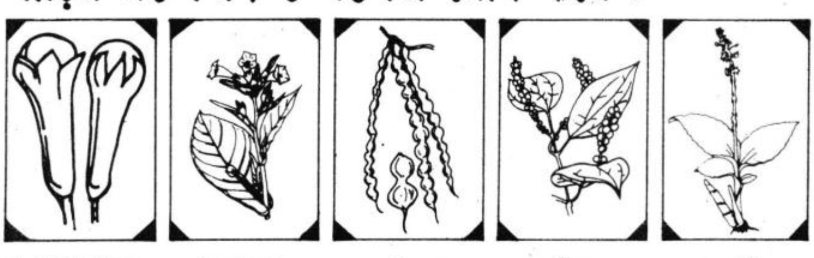

১ লবঙ্গ তেল ঃ মাড়ির যন্ত্রণা রোধ করে।

২। তুমরু ঃ মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

৩। বাবুল ঃ মুখের ঘা সারায়।

৪। পীপল ঃ দাঁতের রোগজীবাণু বিনাশ করে।

৫ শুঁঠ ঃ দাঁতের গোড়া শক্ত করে।

শ্রী বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ ভবন লিমিটেড

ক'লকাতা • পাটনা • ঝাঁসি • নাগপুর • এলাহাবাদ

AVID/BAB/1-84/BEN

"নববধূ তো আমাকে নগদ আধ সভরেন পুরস্কার দিলে। তারপর তারা দুজন দুদিকে চলে গেল। শুধু যাবার আগে আইরিন গডফ্রেকে বললে যে সে বিকেলে পাঁচটার সময়ে পার্কে বেড়াতে যাবে।"

আমি বললুম, "এটা তো আবার নতুন ফ্যাকড়া হল। তারপরে তুমি কী করলে ?"

"তারপর আমি একটু নিজের তদারকি করলুম।"

"সেটা আবার কী ?"

"সকাল থেকে কিছু খাওয়াদাওয়া হয়নি। পেটে ছুঁচোয় ডন কষছিল তাই যাহোক চারটি মুখে দিলুম আর কি। যাকগে ওয়াটসন, এখন কিন্তু তোমার সাহায্য চাই।"

আমি বললুম, "বলো কী করতে হবে ?"

"বেআইনি কাজে আপত্তি নেই তো ?"

"মোটেই না।"

"পুলিশে যদি অ্যারেস্ট করে ?"

"উদ্দেশ্য যদি সৎ হয় তো তাতেও আপত্তি নেই।"

"উদ্দেশ্য যে সৎ এ-ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত হতে পারো।"

"তাহলে আমি তোমার সঙ্গে আছি।"

"তা আমি গোড়া থেকেই জানতুম।"

"তা হলে বলো আমাকে কী করতে হবে ?"

আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে মিসেস টার্নার খাবারের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন, তাঁর হাত থেকে ট্রেটা ধরে নিয়ে হোম্‌স বললে, "দাঁড়াও, খেতে খেতে সব কথা তোমাকে বলছি। ... এখন প্রায় পাঁচটা বাজে। দুঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে আমাদের ঘটনাস্থলে হাজির হতে হবে। মিস আইরিন, বুড়ি মাদাম আইরিন ঠিক সাতটার সময় বেড়িয়ে বাড়ি ফেরেন। সেই সময়ে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

"তারপর ?"

"তার পরের কথা আমার ওপর ছেড়ে দাও। সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। শুধু একটা কথা। যাই ঘটুক না কেন তুমি কোনোভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে না।"

"আমি শুধুই দর্শক ?"

হোম্‌স বললে, "গোড়ার দিকে খানিকটা তাই। যাই হোক, মন দিয়ে শোনো। ওখানে একটা ছোটখাটো গণ্ডগোল হয়তো হবে, আর আমাকে হয়তো ধরে ব্রিওনি লজের মধ্যে নিয়ে যাবে, তাতেও তুমি বিচলিত হবে না। মিনিট তিন-চার পরে একটা ঘরের জানলা খুলে যাবে আর তুমি চুপি-চুপি ঐ জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে।"

"বেশ।"

"তারপর আমি এইভাবে হাত তুললে, তখন যে জিনিসটা তোমাকে এখন দেব সেটা ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে 'আগুন, আগুন' বলে চেঁচাবে। বুঝলে ?"

"বুঝেছি।"

"এটা মারাত্মক কোনো কিছু নয়," বলে হোমস পকেট থেকে লম্বা সিগারের আকারের একটা জিনিস বের করে আমাকে দিলে। "এটা একটা পটকা। সাধারণ পটকা থেকে তফাত এই মাত্র যে এর দু দিকেই বারুদ থাকায় আলাদা করে আগুন দিতে হয় না। তোমার কাজ হল ঐ পটকা ছুঁড়ে দেওয়াটুকু। তুমি 'আগুন' বললেই চারপাশের আর সকলে চিৎকার শুরু করে দেবে আর সেই সুযোগে তুমি ওখান থেকে চলে এসে বড় রাস্তার মোড়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আমি মিনিট-দশেকের মধ্যে ঐখানে পৌঁছে যাব।"

আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম যে তাই হবে। হোমস তখন নিজের ঘরে গেল বাইরে বের হবার জন্যে প্রস্তুত হতে।

হোম্‌সের ঘর থেকে বেরিয়ে এল অত্যন্ত নিরীহ ভালমানুষ এক মাঝবয়সী পাদ্রি। হোম্‌সের ছদ্মবেশ নেওয়ার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল এই যে, সে যখন যে চরিত্রের ছদ্মবেশ নেয় তখন ঠিক সেই চরিত্রের অনুযায়ী কথাবার্তা তো বলেই, চলাফেরাটাও হুবহু তাদের মতো করে। আমার এক-এক সময় মনে হয় যে, হোম্‌স যদি অভিনয় করত তাহলে তার সমকক্ষ অভিনেতা পাওয়া শক্ত হত।

সোয়া ছটা নাগাদ বেকার স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে আমরা যখন সার্পেন্টাইন অ্যাভিনিউয়ে পৌঁছলুম তখন সাতটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। সন্ধে হয়ে এসেছে। রাস্তার আলো সেই সবে একটা দুটো করে জ্বলতে শুরু করেছে। হোম্‌সের মুখে ব্রিওনি লজের যেরকম বিবরণ শুনেছিলুম বাড়িটা অবিকল সেইরকম। তবে আমি ভেবেছিলুম এলাকাটা নির্জন হবে। তা কিন্তু মোটেই নয়। রাস্তায় লোকজনের বেশ ভিড় আছে। দেখলুম রাস্তার একদিকে আধময়লা জামাকাপড় পরা কয়েকজন লোক জটলা করছে। তাদের থেকে কিছুটা দূরে একটা ছুরি-কাঁচি-শানওলা আর জনদুয়েক পাহারাদার নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করছিল। তাছাড়া পথচারীও কমতি ছিল না।

আমরা ব্রিওনি লজের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছিলুম। হোম্‌স বললে, "এখন ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। আমার মনে হয় ছবিটা ওঁর কাছেই আছে। এখন প্রশ্ন হল কোথায় আছে ?"

"সেই তো, কোথায় আছে সেটাই প্রশ্ন।"

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছবিটা উনি সঙ্গে নিয়ে বেড়ান না। প্রথমত ক্যাবিনেট সাইজের ছবি নিয়ে ঘোরাঘুরি করা অসুবিধেজনক আর দ্বিতীয়ত, উনি জানেন যে বোহেমিয়ার রাজা ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে যে-কোনো সময়ে ওঁকে রাস্তায় আটকাতে পারেন।"

"তাহলে ছবিটা আছে কোথায় ?"

"অনেক জায়গাতেই থাকতে পারে। ব্যাঙ্কের সেফ ডিপোজিট ভল্টে থাকতে পারে। তাঁর উকিলের কাছেও থাকতে পারে। তবে আমার ধারণা ছবিটা ওঁর কাছেই এবং ঐ বাড়িতেই আছে। কেননা সাধারণত মেয়েরা নিজেদের জিনিস নিজেদের কাছেই রাখতে চায়।"

"কিন্তু ওঁর বাড়িতে তো দুবার চুরি করানো হয়েছে," আমি বললুম।

"আরে দূর, ওরা জানেই না জিনিসটা কোথায় আছে।"

"তুমিই কি জানো যে খুঁজে পাবে ?"

"আমি তো খুঁজব না। উনিই আমায় দেখিয়ে দেবেন।"

"কেন উনি তা করতে যাবেন শুনি ?"

"না করে ওঁর উপায় থাকবে না। ... ঐ বোধহয় ওঁর গাড়ি এসে পড়ল। যেমন যেমন বলে দিয়েছি সেইমতো করো।" হোমস চট করে কোথায় মিলিয়ে গেল।

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

Olympics '84

For Sportsworld readers a grand treat in colour and black & white

And a thorough on-the-spot assessment by our team of writers

Watch out for

Sportsworld

From the Ananda Bazar Group of Publications

গুরু-শিষ্য

রথীন্দ্র সেনগুপ্ত

ষোলো এক্কে ষোলো,
ষোলো দুগুনে কী ?
—উঃ লাগছে, হাতটা ছাড়ো,
নইলে বলবনি

দশের থেকে তিন নিয়েছি,
বাকি রইল কত ?
—তোমাকে না অনেকটা ঠিক
দেখতে ভীমের মতো

তিন জোড়াতে ক'টা থাকে
হারালে তিন পাটি ?
—বলছি দাড়াঁও, বেলেডটা দাও,
পেনসিলটা কাটি

জল্‌দি করো বিয়াল্লিশকে
চোদ্দ দিয়ে ভাগ ;
—করছি থামো, তোমার দেখছি
বড্ড বেশি রাগ !

বেয়াদপি করলে এবার
চড়-চাপাটি পাবে !
—গুরুমশাই, এক পেয়ালা
গরম কফি খাবে ?

সাক্ষাৎকার

রতনতনু ঘাটী

যাবি কোথায়, দিদির বাড়ি ?
বয়স আমার এককুড়ি দুই—
কী যে বলিস, দূর আনাড়ি !

নামটি কী তোর, পদবী কী ?
সাকিন আমার আনন্দগড়
পাশের গাঁটি পদ্মদিঘি

কীই-বা পড়িস, বয়স কত ?
হাবুল নামের পাশে বসাই
কুমার-টুমার ইচ্ছেমতো !

বললি সবই, দেশটা কোথা ?
গাঁয়ের পাশেই সবুজ নদী—
নদীটি বেশ খরস্রোতা !

ছবি : দেবাশিস দেব

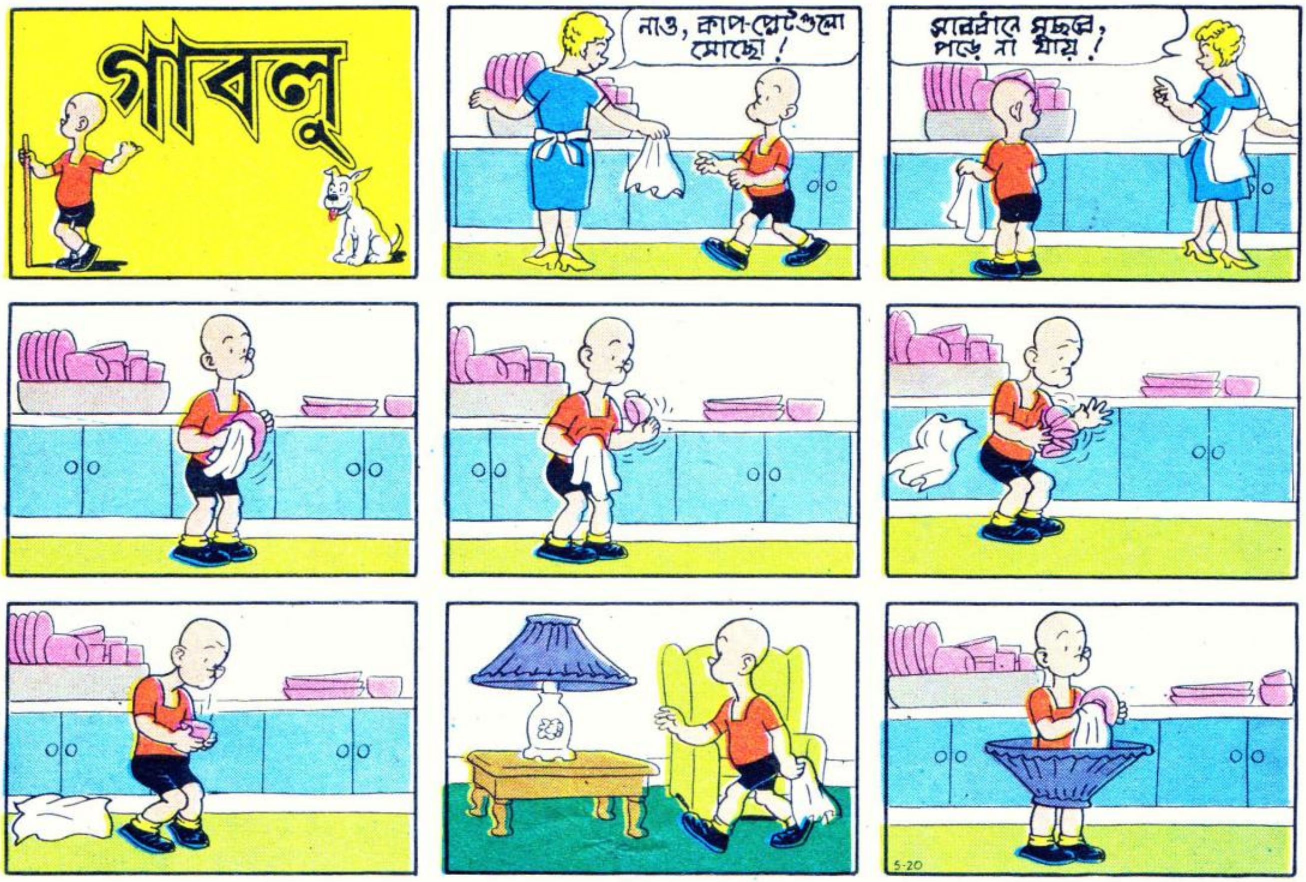
গাবলু
নাও, কাপ-প্লেটগুলো মোছো!
সাবধানে মুছবে, পড়ে না যায়!
5-20

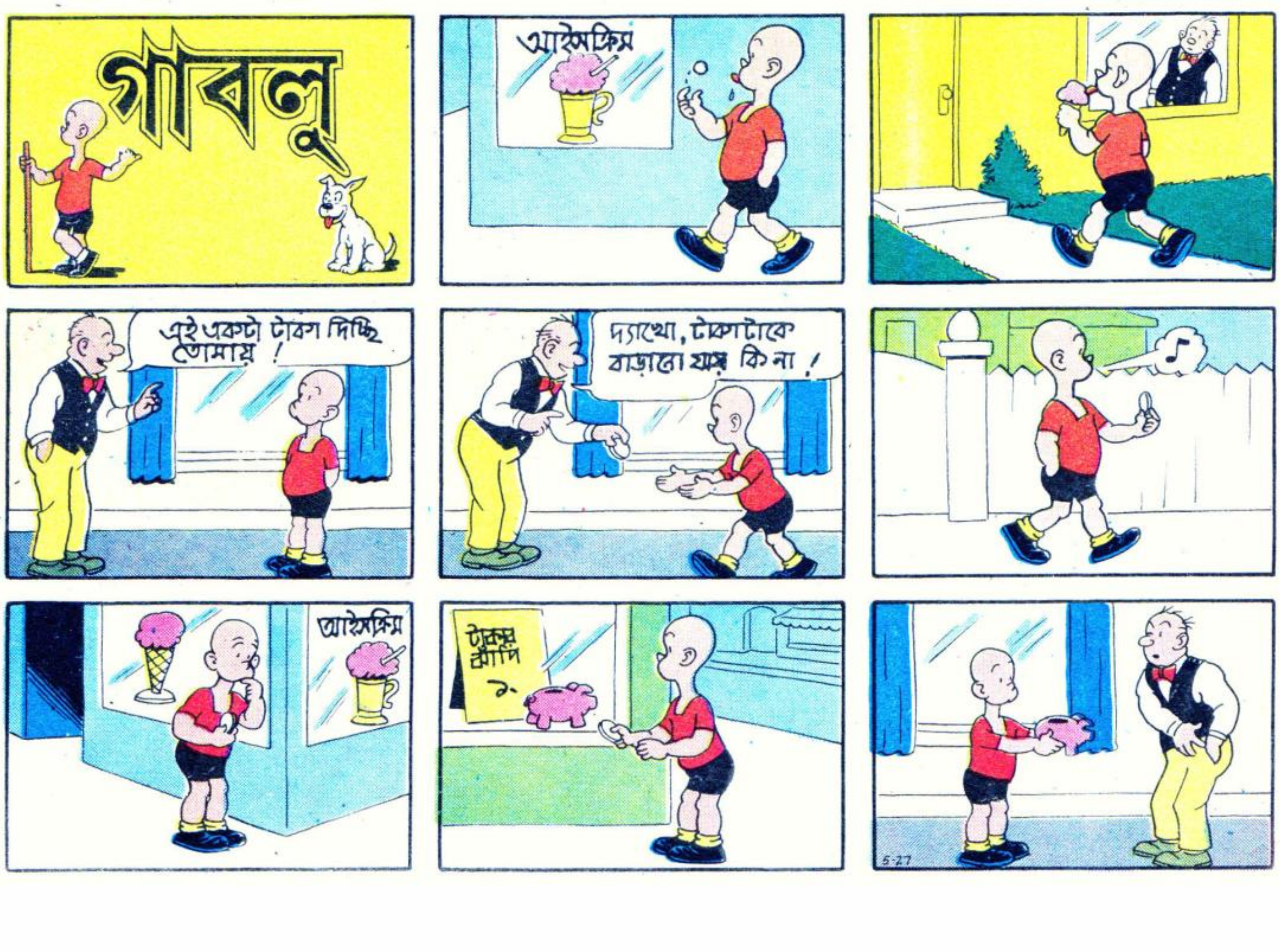
গাবলু
আইসক্রিম
এই একটা টাকা দিচ্ছি তোমায়!
দ্যাখো, টাকাটাকে বাড়ানো যায় কি না!
আইসক্রিম
টাকার ঝাঁপি
৯
5-27

ফ্ল্যাশ গর্ডন

ফ্ল্যাশ আর ভাল্টান ইতিমধ্যে প্রতিপক্ষকে কাবু করেছে···
চলো সামনে।
যুদ্ধ শুরু হলে আমি আর ফ্ল্যাশ ঝাঁপিয়ে পড়ব।
এতে কাজ হবে তো ভালটান?
প্রাসাদের তোরণে আছে বিদ্যুতের বেড়া। সেটা ভাঙলেই পক্ষী-মানবরা প্রাসাদে ঢুকে পড়বে।
রাজপ্রাসাদে শুরু হয়েছে বিবাহ অনুষ্ঠান···
ফ্ল্যাশ আসছে না কেন?
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

সেই বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে খেলে যেতে লাগলাম সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার শরীরে ও মনে নতুন শক্তি এনে দিয়েছিল। দিনের শেষে অপরাজিত অবস্থায় ফিরে এলাম। সে রাত্রিতেও ভাল ঘুম হল না। চতুর্থ দিনে আবার সেঞ্চুরি করলাম। আমার ধৈর্য, সাহস ও পরিশ্রমের পুরস্কার। নিজের ইনিংস শেষ করে যখন ফিরে এলাম লুটিয়ে-পড়া বাংলা দল কোমর সোজা করে উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রায় সত্তর ভাগ নিরাপত্তায় তুলে আনতে পেরেছি বাংলা দলকে। মেরুদণ্ডে লড়াই করার মতো জোর পাওয়া গেছে। কিন্তু আমার অবস্থা সাংঘাতিক। হাতে-পায়ে যেন আর বল নেই। শক্তিহীন হাড়মাংসের পুতুল হয়ে গেছি। তাঁবুতে ফিরে ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে দেওয়ামাত্র মনে হল, অতল সাগরের মধ্যে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছি। হাত-পা নাড়িয়ে নিজেকে বাঁচাবার সামর্থ্যটুকুও নেই। অজস্র লোকের অভিনন্দনবাণী আমার কাছে অনেক দূর থেকে ভেসে-আসা কলরবের মতো শোনাচ্ছে। বোধহীন যান্ত্রিক ঝাঁকুনির মতো করমর্দন করে যাচ্ছি। লোকজনের সান্নিধ্য বড় বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। কতক্ষণে একটু ঘুমোতে পারব? নিশ্চিন্ত নিদ্রা। আমি এখন ঘুমোতে চাই।

কিন্তু উপায় নেই। হায়দরাবাদের দ্বিতীয় ইনিংস রয়েছে। মাঠে যেতেই হবে। তার আগে খানিকটা বিশ্রাম না নিলেই নয়। একলা খানিকক্ষণ ইজিচেয়ারে পড়ে রইলাম।

কিন্তু গা এলিয়ে বেশিক্ষণ শুয়ে থাকার উপায় ছিল না। হায়দরাবাদের দ্বিতীয় ইনিংস গোটাটাই বাকি। তা ছাড়া, হায়দরাবাদের ব্যাটিং-শক্তি, আগেই বলেছি, বেশ সমীহ করার মতো। সুতরাং, যে রানটা তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেটা একেবারে অসাধ্য সংখ্যা ছিল না। আমার আরও চিন্তা হচ্ছিল এই কারণে যে, খেলাটির নাম ক্রিকেট, যে-কোনো মুহূর্তে ওলট-পালট হয়ে যাওয়াটাই যে খেলার বিশেষত্ব। অতএব মাঠে নেমে গেলাম আমরা।

দ্বিতীয় ইনিংসে হায়দরাবাদকে একদম শুইয়ে দিল বাংলা। দুরন্ত কালবৈশাখীতে বড় বড় গাছ ভেঙে পড়া দেখেছ তো? গাছগুলোকে প্রচণ্ড দুলিয়ে একসময় গোড়া উপড়ে দেয়। ঠিক একইভাবে গোড়াসুদ্ধ উল্টে পড়ল শক্তিশালী হায়দরাবাদ। মহারথী ব্যাটসম্যানদের বাংলার বোলাররা খুশিমতো হেলাল, দোলাল। কোনো প্রতিরোধই তেমনভাবে টিকল না। একটা একটা করে সমস্ত জোর হারিয়ে হায়দরাবাদ যখন মুখ থুবড়ে পড়ল, তখন বোর্ডে রান মাত্র ১২১। বাংলাকে পরাজিত করার লক্ষ্য থেকে তখনও তারা ১৮৪ রান পেছনে। অর্থাৎ বাংলা সরাসরিভাবে হারিয়ে দিল হায়দরাবাদকে।

খেলা শেষ হওয়ার পর শ্রীযুক্ত রয় গিলক্রিস্টের শ্রীমুখখানা দেখার বড় ইচ্ছা হচ্ছিল। কানপুরে টেবিল চাপড়ে সে বলেছিল, 'মেরে তোমাদের মুখ ভেঙে দেব, দেখে নেব বাংলাকে, আধখানা দলকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করব,' ইত্যাদি নানা লম্বা-চওড়া কথা। এখন, হায়দরাবাদ বাংলার কাছে হেরে যাওয়ার পর সেই বীরবরকে একবার দেখার এবং সেই কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। হয়তো চেষ্টা করলে সহজে ইচ্ছাপূরণ করা যেত। কিন্তু তারপরেই মনে হল, দ্যাট্স নট ক্রিকেট। উত্তর যা দেওয়ার তা মাঠে দেওয়া হয়ে গেছে। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, গিলক্রিস্টের সীমাহীন অহঙ্কারের একটা লাগসই জবাব দেব। দিয়েছি। এখানেই আমার জয়। আবার নতুন খোঁচা দেওয়ার দরকার কী? তার চেয়ে বরং গিলক্রিস্ট পরাজয়ের অন্ধকারে বসে বসে এখন অপমানের বিষ হজম করুক। রয় গিলক্রিস্টের সঙ্গে আর দেখা করতে গেলাম না।

আরও একজনের কথা সে-সময়ে খুব মনে পড়ছিল। ফারুক এঞ্জিনিয়ার। কানপুরে কিংকে তাতাবার জন্য সে জয়সীমার সঙ্গে যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা বলেছিল, সে-সব মনে পড়ছিল আমার। বাংলা দলে বোলার কেউ থাকতে পারে বলে সে মনেই করেনি। ফারুককে হায়দরাবদের দ্বিতীয় ইনিংসটা দেখাতে পারলে বেশ হত। দুর্গাশঙ্কর মুখার্জির বোলিং দেখলে সে স্বীকার করতে বাধ্য হত, লেস্টার কিং ছাড়াও বাংলায় বল করার মতো লোক আছে এবং তারা হায়দরাবাদের মতো শক্তিশালী দলের কোমর ভেঙে ফেলতে পারে। এই খেলায় হায়দরাবাদের ব্যাটসম্যানদের একেবারে নাচিয়ে দিয়েছিল দুর্গাশঙ্কর মুখার্জি। মাত্র তেইশ রানের বিনিময়ে সে চারটে উইকেট পেয়েছিল। খেলাশেষে সকলে যখন মাঠে ফিরলাম তখন প্রত্যেকের মুখে ডি· এস· মুখার্জির বোলিংয়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা। এই ডি· এস·, দুঃখের বিষয়, টেস্টে ভারতীয় দলে আসার সুযোগ পায়নি। আমার ধারণা, সুযোগ পেলে আন্তর্জাতিক আসরে সে দ্রুত খ্যাতিলাভ করতে পারত।

রাত্রে দেখা হল গিলক্রিস্টের সঙ্গে। নিউ মার্কেটে জিনিসপত্র কিনতে গিয়েছি। এক দোকানের সামনে হঠাৎ কেউ আমার দুই কাঁধে দুটো বলিষ্ঠ হাত রাখল। গলার কাছাকাছি। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, গিলি! সর্বনাশ! গলার কাছে হাত কেন? মাঠে পারেনি, তাই এখানে নিকেশ করে দিতে চায় নাকি? ছিটকে সরে এলাম। বলা যায় না কিছুই! কীর্তির তো অভাব নেই লোকটার।

"ওয়েল প্লেড।" গিলক্রিস্ট অভিনন্দনের হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর হেসে বলল, "ভয় পেয়েছিলে নাকি?"

"পাওয়ারই কথা! সম্বোধনের যা ভাবভঙ্গি তোমার, মাঠে বা মাঠের বাইরে, খুবই বিশ্রী।"

হো হো করে হেসে উঠল কৃষ্ণকায় দানব।

"সি ম্যান, মাঠে আমি একরকম। মাঠের বাইরে একেবারে আলাদা। মাঠে ব্যাটসম্যানদের দেখলেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আর তাদের হেরে যাওয়া কালো মুখ না দেখা অবধি আমার শান্তি হয় না। কিন্তু মাঠের বাইরে তো তাদের

সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই। দে আর ফ্রেণ্ডস। উইকেটের সামনে আমার ছেলে ব্যাট হাতে দাঁড়ালেও, সে রেহাই পাবে না। কারণ, সে তখন ব্যাটসম্যান, আর আমি একজন নামকরা দ্রুতগতির বোলার। সংঘর্ষ অনিবার্য হবেই।"

আমার চোখ বড় হয়ে গিয়েছিল। বলে কী লোকটা! নিজের ছেলেকেও ছেড়ে কথা বলতে রাজি নয়। বিচিত্র মনস্তত্ত্ব। নিউ মার্কেটে দাঁড়িয়ে এইসব কথাবার্তা শুনতে আমার বিশেষ ভাল লাগছিল না। গিলি বোধহয় বুঝতে পেরেছিল সেটা। নিজেই প্রসঙ্গে ছেদ টেনে বলল, "তুমি কী কিনবে?"

"কয়েকটা দরকারি জিনিসপত্র কিনব।"

"আমি কয়েকটা শৌখিন জিনিস কিনতে চাই। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দেব। কলকাতার স্মৃতি।"

যে শৌখিন জিনিসগুলো গিলি কিনতে চেয়েছিল, তার মধ্যে একটা জিনিস সে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিল না। অনেক দোকান ঘুরে সে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তখনই আমার সঙ্গে তার দেখা। ঠিক ওই জিনিসই, আমি জানতাম, একটা দোকানে রয়েছে। কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম। সেই দোকানের কথা বলে দিলাম।

"ওখানে খোঁজ করো। পেয়ে যাবে। একটু আগে দেখে এসেছি।"

"তাহলে এখনই যাওয়া দরকার। থ্যাংক ইউ। গুড নাইট।"

দ্রুতপায়ে গিলক্রিস্ট চলে গেল। তার পরের দিনই বোধহয় সে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। জীবনে অনেক পেস বোলার দেখেছি। এমন রূঢ়স্বভাবের বোলার আর দেখিনি। জেদি, গোঁয়ার, অভদ্র, কিন্তু মারাত্মক বল করতে পারত। গিলক্রিস্ট আমার দেখা সেরা পেসারদের মধ্যে অন্যতম। সব বোলারের জীবনেই একটা সেরা সময় থাকে, যখন গোটা পৃথিবী তাঁর ক্ষমতার সেরা চেহারাটা দেখতে পায়। আমি গিলক্রিস্টের সেরা সময়ের ক্ষমতার চেহারা দেখেছিলাম। ভয়ঙ্কর রূপ তার। লোকটা যদি একটু ভদ্র হত আর মেজাজটা সামলে চলতে পারত, আমার স্থির বিশ্বাস, সে ক্রিকেট-জগতে অনেক বড় জায়গা পেতে পারত। সকলেই জানে, সাধারণভাবে পেস বোলাররা একটু রুক্ষ মেজাজের হয়ে থাকে। একটু বদরাগীও। কিন্তু তার মধ্যে নিজেকে রাশ টেনে ধরে রাখাটাই তো কৃতিত্ব। ওয়েসলি হলের কথা মনে পড়ছে। তিনিও দ্রুতগতির বোলার ছিলেন। কিন্তু তাঁর আচার-আচরণ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ফাস্ট বোলারদের সম্পর্কে যাঁদের ধারণা খুব খারাপ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই আমুদে মানুষটিকে দেখলে তাদের ধারণা বদলে যেতে বাধ্য। একেবারে মাটির মানুষ ছিলেন, এ-কথা বলতে চাইছি না। তবে তাঁর রুক্ষ মেজাজ খুব কমই দেখা যেত। এবং সকলে মানত যে, যথেষ্ট সঙ্গত কারণ না থাকলে ওয়েসলি হল মেজাজ হারিয়ে ফেলেন না। (ক্রমশ)

জেনে নাও

তেল আর জল মিশ খায় না কেন?

মনের মিল হলে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। যতই সে মিল বেশি হবে, ততই দুজন অভিন্ন হয়ে উঠবে—তখন তাদের বলা হয় হরিহর আত্মা।

দুটো তরলের বেলায় সে-রকম বন্ধুত্ব হয় বলা চলতে পারে, একটা তরলকে আর-একটা তরলের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে। একটা দ্রাবক আর একটা দ্রাব।

দ্রাবক হল সেই তরলটি, যাতে অন্য তরল মেশানো হয়। অন্য তরলটি দ্রাব। তেলে যদি কয়েক ফোঁটা জল দেওয়া হয়, তাহলে তেলটা দ্রাবক, জল দ্রাব।

দ্রাবক আর দ্রাবে বন্ধুত্ব হবে কি না অর্থাৎ মিশ খাবে কি না তা বোঝবার সময়ে লক্ষ করতে হবে, তাদের আণবিক গঠন। দুটি ছেলের বা দুটি মেয়ের বেলায় যেমন তাদের মনের মিলের হিসেব নেওয়া হয়, দ্রাবক আর দ্রাবের বেলায় তেমনি তাদের আণবিক গঠনের।

এদের আণবিক গঠনের যখন মিল থাকে, তখন তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ফলে দ্রাবকের মধ্যে দ্রাব দ্রবীভূত হয়।

আর আণবিক গঠনে মিল না থাকলে এরা মিশে যায় না।

তেল আর জলের আণবিক গঠনের কোনো মিল নেই। তেলের অণু আকারে জলের অণুর চেয়ে অনেক বড়। তাছাড়া প্রতিটি তেলের অণুতে পরমাণুর সংখ্যা প্রতিটি জলের অণুতে পরমাণুর সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। সেইজন্যে তেল আর জল মেশে না। অথচ অ্যালকোহল (ইথাইল) আর জলের আণবিক গঠনের মিল থাকায় জল মিশে যায় অ্যালকোহলের সঙ্গে। দুধ আর জলও যে মেশে, তার কারণ তাদের আণবিক গঠন একই ধরনের।

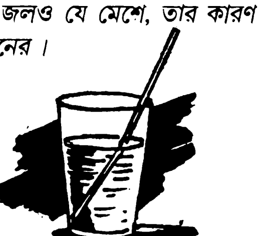

পাইপে টানলে পানীয় উঠে আসে কেন?

শরবতের গেলাসে বা কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতলে পাইপ ডুবিয়ে যেই না টানা, অমনি পানীয় মুখে উঠে আসে। না টানলে নয়, বা পাইপের সঙ্গে পানীয়ের যোগাযোগ না থাকলেও অসম্ভব।

এই টানার সঙ্গে পানীয়ের মুখে উঠে আসার-যে একটা সম্পর্ক আছে এর কারণ কী?

তরলের মধ্যে পাইপ ডুবিয়ে টানার মুহূর্তটিতে কী হয়? পাইপের দুটো প্রান্ত। তরলের মধ্যে পাইপের একটা প্রান্ত, অন্য প্রান্ত মুখে। টান দেওয়ার সময় পাইপের মধ্যে বাতাসের চাপ বাইরের বাতাসের চাপের চেয়ে কমে যায়। বাতাসের চাপের একটা অসম অবস্থা। পাইপের বাইরে তরলের উপরে চাপ বেশি, পাইপের ভেতরে কম। ফলে বাইরের বেশি চাপের জন্যে পানীয় উঠে আসে পাইপ বেয়ে। আর তা পৌঁছে যায় মুখে।

ফলে তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

বল নিয়ে এগোচ্ছেন বাবু মানি। তাঁরই গোলে মোহনবাগান জিতল

মহারণে জয় মোহনবাগানের

অশোক রায়

কথাটা আরেকবার প্রমাণিত হল, দুর্গোৎসবের মতোই কলকাতাকে মাতিয়ে দেয় মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ। একুশে জুলাই কাঁটায় কাঁটায় তিনটে পনেরো। রেফারির বাঁশির সঙ্গে-সঙ্গে ইডেনের সবুজ-নরমে কিংবা টিভির পর্দায় চোখ এঁটে বসে-থাকা মানুষদের হৃৎপিণ্ড তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। শুরু হল মহারণ। শুরু হল সেই লড়াই, যার জন্যে গোটা কলকাতা কদিন ধরে দাঁড়িয়ে ছিল বারুদের স্তূপের ওপর।

প্রথম মিনিটেই প্রদীপ ঘোষ শিখা বিস্তার করেন ডানদিক থেকে। এবং মোহনবাগান বাঁচে কর্নারের বিনিময়ে। কিন্তু তারপর থেকেই দ্রুত ঘর সামলে নেয় মোহনবাগান এবং ছড়িয়ে পড়ে পাল্টা আক্রমণে। যদিও মেনে নেওয়া ভাল, প্রথম পর্বে দু'পক্ষের আক্রমণই ছিল ভারশূন্য, হাল্‌কা।

উত্তেজনাহীন, একঘেয়ে প্রথমার্ধের ঝুলে-যাওয়া খেলা দেখে যখন একটি নিশ্চিত ড্রয়ের চিন্তা জাগছিল, ঠিক তখনই ম্যাচের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি ঘটে গেল। দ্বিতীয়ার্ধে খেলার বয়স তখন সাত মিনিট। ইস্টবেঙ্গল পেনাল্টি-বক্সের বাইরে থেকে প্রশান্তর বাঁ পায়ের 'ডায়াগোনাল স্পিন' মেশানো আপাত-নিরীহ ফ্রিকিকটি দুই স্টপারের মধ্যে ঝুলে রইল, অল্পসময়। সেই সামান্য ফাঁকে কৃষ্ণগোপাল ছুটে এসে মাথা ছুঁইয়ে বলের গায়ে বাবু মানির ঠিকানা লিখে দিলেন। ডিপ-ডিফেন্সের দুটি সবচেয়ে মজবুত মিনার মনোরঞ্জন-তরুণকে পায়ের ছোট্ট টাচে টলিয়ে দিয়ে কৃতজ্ঞ বাবু মানি ঠাণ্ডা মাথায় বল ঠেলে দিলেন জালে। 'গোঁ-ও-ল' শব্দে গর্জে উঠল ইডেন।

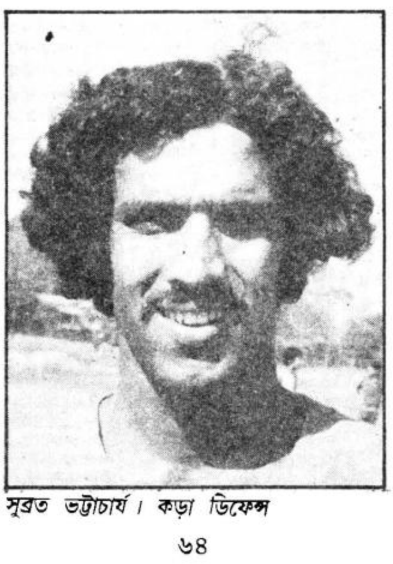

সুব্রত ভট্টাচার্য। কড়া ডিফেন্স

মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল সব কিছু। বিস্মিত ইস্টবেঙ্গল-সমর্থকরা শুধু দেখলেন, ডিফেণ্ডাররা নির্বাক, হতভম্ব। অসহায়ভাবে মাটিতে পড়ে আছেন শেষ প্রহরী ভাস্কর। এবং উনিশ নম্বর জার্সি পরা একটি কানাড়ি যুবক তাঁদের সব সম্মান স্বপ্ন লুঠ করে, দু'হাত আকাশে ছড়িয়ে মিশে গেল মোহনবাগানিদের আলিঙ্গনে, উল্লাসে।

গোল খাবার পর থেকেই নড়ে গেল ইস্টবেঙ্গলের আস্থা। এবং শুরু হল ছন্নছাড়া ফুটবল। ভুল পাসের জঞ্জাল এবং উদ্দেশ্যহীন পরিকল্পনার পাকে পাকে ক্রমেই জড়িয়ে পড়লেন ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়েরা। আর ঠিক ওই সময় থেকেই সারা মাঠে বিকশিত হতে থাকেন বিকাশ। ইস্টবেঙ্গলের দুই মিডফিল্ডার গৌতম এবং মিহির নামক সাপ্লাই-লাইনটিকে সম্পূর্ণ অকেজো করে গোটা মাঠে রাজত্ব করলেন বিকাশ পাঁজি, দাপটের সঙ্গে। সেইসঙ্গে আরেকজনকেও মনে পড়বে, মাথায় দু'দফায় পনেরোটা সেলাই নিয়েও ওপরের বল-দখলের লড়াইতে যিনি একটিবারের জন্যেও হার মানেননি। ইডেন দেখে মুগ্ধ হয়েছে শূন্যে ভাসানো সেন্টারগুলো ফেট্টি-বাঁধা একটি মাথায় প্রতিহত হয়েছে একের পরে এক। যন্ত্রণাকে জয় করে অসাধারণ ফুটবল উপহার দিলেন সুব্রত ভট্টাচার্য। মোহনবাগান ডিফেন্সে এখনও যে-নামের কোনো বিকল্প নেই।

খেলা-শেষে টেন্টের বাইরে অপেক্ষা করে ছিলেন বিশাল জনতা একুশে জুলাইয়ের হিরো বাবু মানিকে দেখবেন বলে। টেন্টের দরজায় মানি এসে দাঁড়াতেই একসঙ্গে কিছু মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এবং পলকে বাবু মানির শরীরটা উঠে গেল সমর্থকদের কাঁধের উপর। হাত নাড়লেন মানি, উত্তাল সমর্থকরাও পাল্টা হাত নাড়লেন। ওর মধ্যে একজন ভদ্রলোক কেবল হাত নাড়লেন না। ওঁর চোখের কোণে তখন আনন্দাশ্রু চিকচিক করছে। উনি মানির বাবা।

এই পরাজয়ে লিগ থেকে আপাতত পিছিয়ে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। আগেই ছিটকে গিয়েছিল মহামেডান। সুতরাং মোহনবাগানের নৌকোর পালে এখন জোয়ারের বাতাস।

ক্যারিবিয়নরা সিরিজ জিতল

মণীশ মৌলিক

লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে একটি অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটাবার পর, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সিরিজ-জয় সম্পর্কে বোধহয় কারও কোনো সন্দেহ ছিল না। শুধু, দেখার ছিল, ইংল্যাণ্ড বড় মাপের কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে কি না! কিন্তু লিডসে, তৃতীয় টেস্টেও ক্যারিবিয়নরা প্রতিপক্ষকে ছিঁড়ে টুকরো

চতুর্থ টেস্টেও ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ৬৪ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে হেরেছে। অর্থাৎ সিরিজের ফলাফল এখন ০-৪। চতুর্থ টেস্টে গ্রিনিজ আবার ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন।

টুকরো করে ফেলে রাবার দখল করে নিল এই মরসুমে, বাকি দুটি টেস্টে ইংল্যাণ্ডের দুর্ভাগ্য আরও প্রকট হয়ে দেখা দেবে কি না সে-কথা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে। এই লেখা বার হতে-হতে তা অবশ্য তোমরা জেনেও গেছ

দ্বিতীয় টেস্টে 'অকল্পনীয়' পরাজয়ের পর, ইংরেজ নির্বাচকরা দলে কিছু অদলবদল করলেন। আনা হল পল অ্যালট, নিক কুক এবং একেবারে নতুন মুখ পল টেরিকে। কিন্তু প্রথম ইনিংসে মান বাঁচালেন অ্যালান ল্যাম। তাঁর শতরানের জোরেই ইংল্যাণ্ডের রানসংখ্যা ভদ্র অবস্থায় উঠে আসে। তুড়ি মেরে ২৭০ রানের মোকাবিলা করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে ল্যারি গোমসের ধৈর্যে আর হোল্ডিংয়ের বেপরোয়াপনায়। গোমস (অপরাজিত ১০৪) সেঞ্চুরি করতে পারতেন না, যদি আহত মার্শাল না মাঠে নামতেন। গোমসের শ্রমের পুরস্কার ষোলো আনা মিলিয়ে দিতে মার্শাল এক হাতে ব্যাট ধরে, স্রেফ ঠেকা দিতে, ক্রিজে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর, তিনি যখন আউট হন, তখন তাঁর দল বত্রিশ রানে এগিয়ে গেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩০২।

এই অবস্থায়, সবাই যখন ম্যাচটা উত্তেজনাময় হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন, ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে তখন হতাশার কালো ছায়া নেমে

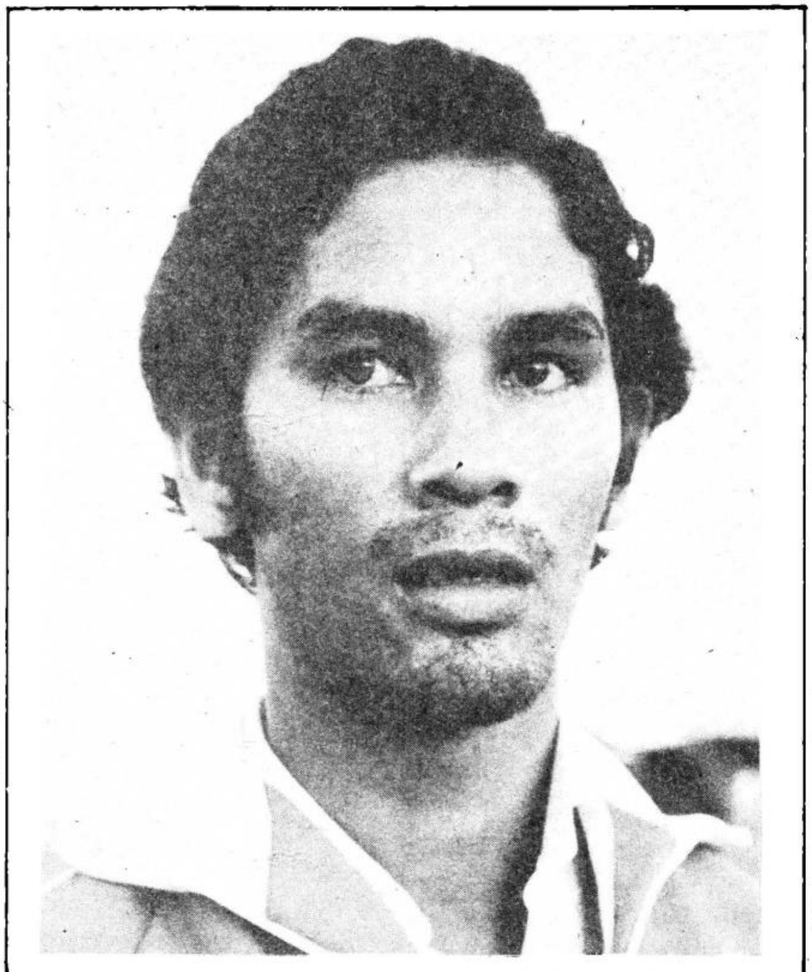

ল্যারি গোমস্। বিপর্যয়ের মুখে ঠাণ্ডা মাথা, অপরাজিত ১০৪

আসে। সূচনাকারী ব্যাটসম্যান গ্রিম ফাউলার এবং অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ার কিছুটা যুদ্ধ করেছেন বটে, তবে তা ইংল্যাণ্ডকে বাঁচাবার পক্ষে যথেষ্ট

মার্শাল। আহত, তবু ভয়ঙ্কর

ছিল না। ১৫৯ রানে ইংল্যাণ্ডকে মুড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে মার্শালের ভূমিকাই ছিল প্রধান। ৫৩ রানে সাত উইকেট নিয়ে তিনি 'ম্যান অব দি ম্যাচ'-এর অন্যতম দাবিদার হয়ে দাঁড়ান। বিচারক টনি লুইস অবশ্য নির্বাচন করেছেন ল্যারি গোমসকে, তাঁর ধৈর্য ও সাহসপূর্ণ শতরানের ইনিংসটির জন্য। বাকি কাজটুকু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে কষ্টকর ছিল না মোটেই!

একদিনের বেশি সময় হাতে রেখে, মাত্র দুটি উইকেট খুইয়ে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় প্রায় হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে। ১৯২১ সালে ওয়ারউইক আর্মস্ট্রং ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে পরপর তিনটে টেস্টে জিতে সিরিজ-জয়ের যে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন, লয়েড এখন সেই অনুভূতিতে মগ্ন। ম্যাঞ্চেস্টার আর ওভাল টেস্ট তো এখন নিয়মরক্ষার খেলা।

মহমেডান-ইস্টবেঙ্গল ১-১

সুব্রত সিংহ

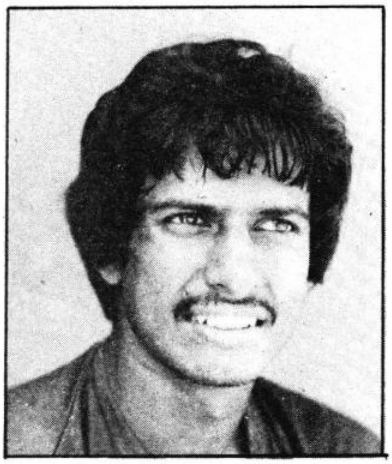

ইস্টবেঙ্গলের বিশ্বজিৎ

কলকাতা ফুটবল লিগের দ্বিতীয় প্রদর্শন খেলাটি বর্ষণসিক্ত ইডেনে অমীমাংসিতভাবে শেষ হল। প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দল ছিল কলকাতার তিন প্রধানের অন্যতম দুই প্রধান, মহমেডান ও ইস্টবেঙ্গল। এই দুটি ডাকসাইটে দল মাঠে নামলেও খেলাটিকে ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে তেমন কিছু উৎসাহ-উদ্দীপনা কিন্তু লক্ষ করা যায়নি। সাধারণত কলকাতার ফুটবলে দেখা গেছে যে, যখনই এই তিনটি দল পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে, তখনই এই তিন দলের সমর্থকদের মধ্যে একটা অন্য ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগে। মাঠের আসনগুলিও থাকে পরিপূর্ণ। কিন্তু এবারের ইডেনের চেহারা ছিল একটু ভিন্ন। দর্শকাসনের বেশ কিছুটা অংশ ছিল একেবারে ফাঁকা। তবে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের তুলনায় মহমেডানের সমর্থকরাই সেদিন বেশি সংখ্যায় মাঠে উপস্থিত ছিলেন।

ফুটবলপ্রেমীদের কাছে এই খেলাটির আকর্ষণ কমে গেলেও প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলের কাছে খেলাটির গুরুত্ব ছিল কিন্তু যথেষ্ট। তা ছাড়া ছিল মর্যাদা রক্ষার লড়াই।

১৯৩৪ সালে এই দুটি দল প্রথম পরস্পরের মুখোমুখি হয়। আর সেই থেকে এই দুটি দল যখনই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়, তখনই সেটা মর্যাদার লড়াই হয়ে দাঁড়ায়।

দু'দলের কাছে খেলাটির গুরুত্বও ছিল অনেকখানি। এ-বছর ফেডারেশন কাপের ফাইনালে মহমেডান ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছিল। সুতরাং ইস্টবেঙ্গল দলের সামনে সুযোগ এসেছিল সেই হারের প্রতিশোধ নেওয়ার। তাছাড়া প্রথম প্রদর্শনী ম্যাচে মোহনবাগানের কাছে পরাস্ত হওয়ায় তারা যে সম্মানটি খুইয়েছিল, সেটি পুনরুদ্ধারের জন্য মহমেডানকে হারানো ইস্টবেঙ্গলের কাছে ছিল একান্ত প্রয়োজন। অপরদিকে মহমেডানের লক্ষ্য ছিল ম্যাচটি না হেরে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের বিরুদ্ধে এ-বছরের অপরাজিতের আখ্যাটি অটুট রাখার।

বেশ কয়েকদিনের বৃষ্টি, বিশেষ করে খেলার দিন সকালে প্রবল বর্ষণের ফলে অনেকের মনেই ভাল খেলা না দেখতে পাওয়ার একটা আশঙ্কা জেগেছিল। আশঙ্কাটা যে খুব একটা অযৌক্তিক ছিল, তাও নয়। কেননা, কর্দমাক্ত ও ভারী মাঠে ভাল ফুটবল খেলা খুবই শক্ত ব্যাপার।

খেলার প্রথম দিকে মহমেডান বেশ কিছু আক্রমণ করেছিল। বিশেষ করে তারা পেছন থেকে উঁচু করে বল ফেলেছিল ইস্টবেঙ্গলের পেনাল্টি বক্সে। উদ্দেশ্য ছিল একটাই। তাদের দুই

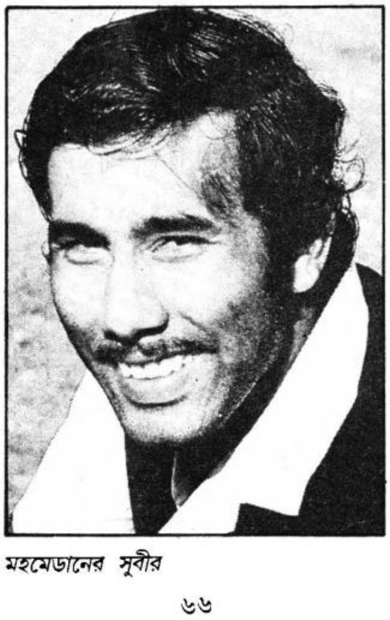

মহমেডানের সুবীর

স্ট্রাইকার সাবির ও জামসিদ হেডে দক্ষ, এই কথা ভেবেই কোচ সাত্তার সেরকম কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সেই পরিকল্পনা আদৌ ফলপ্রসূ হয়নি মূলত দুই স্টপার মনোরঞ্জন ও তরুণের দক্ষতায়। এছাড়া তাদের লিংকম্যান দেবাশিস মিশ্র একক প্রচেষ্টায় গোল করার দুটি সুযোগের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তা থেকে গোল হয়নি। পক্ষান্তরে যে গোলটি করে মহমেডান এগিয়ে যায়, সেটি একটি অপ্রত্যাশিত গোল। মাঝ মাঠে ফ্রি-কিক্ থেকে উঁচু হয়ে আসা বল সাবিরের মাথা ছুঁয়ে কয়েকটি ড্রপ খেয়ে ভাস্করের কাছে যায়। অতি সহজ বল। কিন্তু সারা মাঠকে হতবাক্ করে ওই সাধারণ বলটি ভাস্করের বুক থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। সামনেই ওত পেতে অপেক্ষা করছিলেন সুবীর। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় তিনি বলটি জালে ঠেলে দেন।

যাই হোক্, গোল খেয়ে আহত বাঘের মতো প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেদিন ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়েরা। খেলার সময় যতই গড়াচ্ছিল, ততই তাঁরা খেলাটিকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছিলেন। মুহুর্মুহু আক্রমণ হেনে মহমেডানের রক্ষণভাগকে তাঁরা হিমশিম খাইয়ে দেন।

প্রথমার্ধে তাঁরা গোল না পেলেও দ্বিতীয়ার্ধে তাঁরা গোলটি শোধ করে দেন। মহিয়ুলের হেডে ফেরত পাঠানো একটি বল পেয়েই মিহির সেটিকে উঁচু করে পেনাল্টি বক্সে ফেললে বিশ্বজিৎ সেই বলটি ধরেই কালক্ষেপ না করে তৎক্ষণাৎ দশ গজের শটে অতনুকে পরাস্ত করে দলের মান রক্ষা করেন। নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার গোল।

এর কিছু পর ইস্টবেঙ্গল আর-একটি গোল পেতে পারত। গৌতমের বদলি হাফ সুনির্মল প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূর থেকে একটি দুর্দান্ত শট্ নিয়েছিলেন কিন্তু ততোধিক তৎপরতায় অতনু সেটিকে ফিস্ট করে বারের উপর দিয়ে তুলে দিয়ে একটি নিশ্চিত গোল থেকে ইস্টবেঙ্গলকে বঞ্চিত করেন। ইস্টবেঙ্গলের এই তরুণ হাফ সুনির্মল কিন্তু তাঁর প্রথম বড় ম্যাচেই সকলের নজর কেড়ে নিয়েছেন।

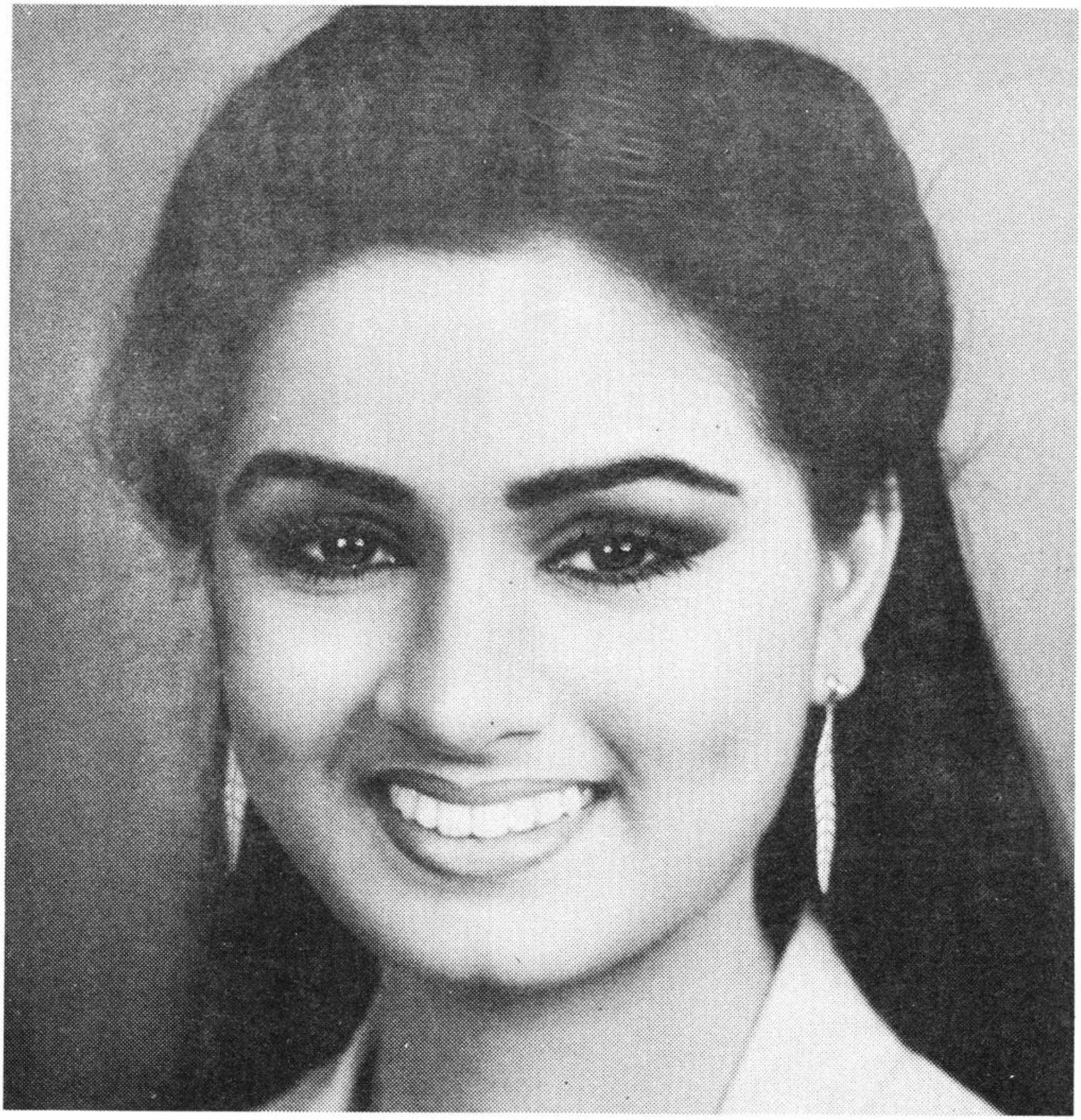

"গতিই হল জীবন!"

"আমার জীবন হ'ল সাগরের তরঙ্গ ও তুফানে ভরা ঢেউয়ের মারকে চিরে বেরিয়ে, তীরবেগে ভাগতে থাকা এক নৌকো।

ঠিক যেমন, সারারাত মশগুল হয়ে থাকা পার্টিতে পৌঁছনোর জন্যে সাঁই সাঁই ক'রে ধাওয়া মোটরবাইক — যেমন, একসঙ্গে পাঁচ পাঁচটি ছবিতে কাজ করার ঝড়ের মত গতিবেগ।

তবে, এই এত দৌড়ঝাঁপ সত্ত্বেও, আমার রঙরূপকে সদা সুন্দর ও সুকোমল রাখে আমার সৌন্দর্য সাবান এই লাক্স!"

শুদ্ধ, স্নিগ্ধ লাক্স—চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান।

HLL-1129

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

ANANDAMELA 22 AUGUST 1984 REGD. NO. WB/CC/264 MH-BY-SOUTH 683 TN/MS (C)/731

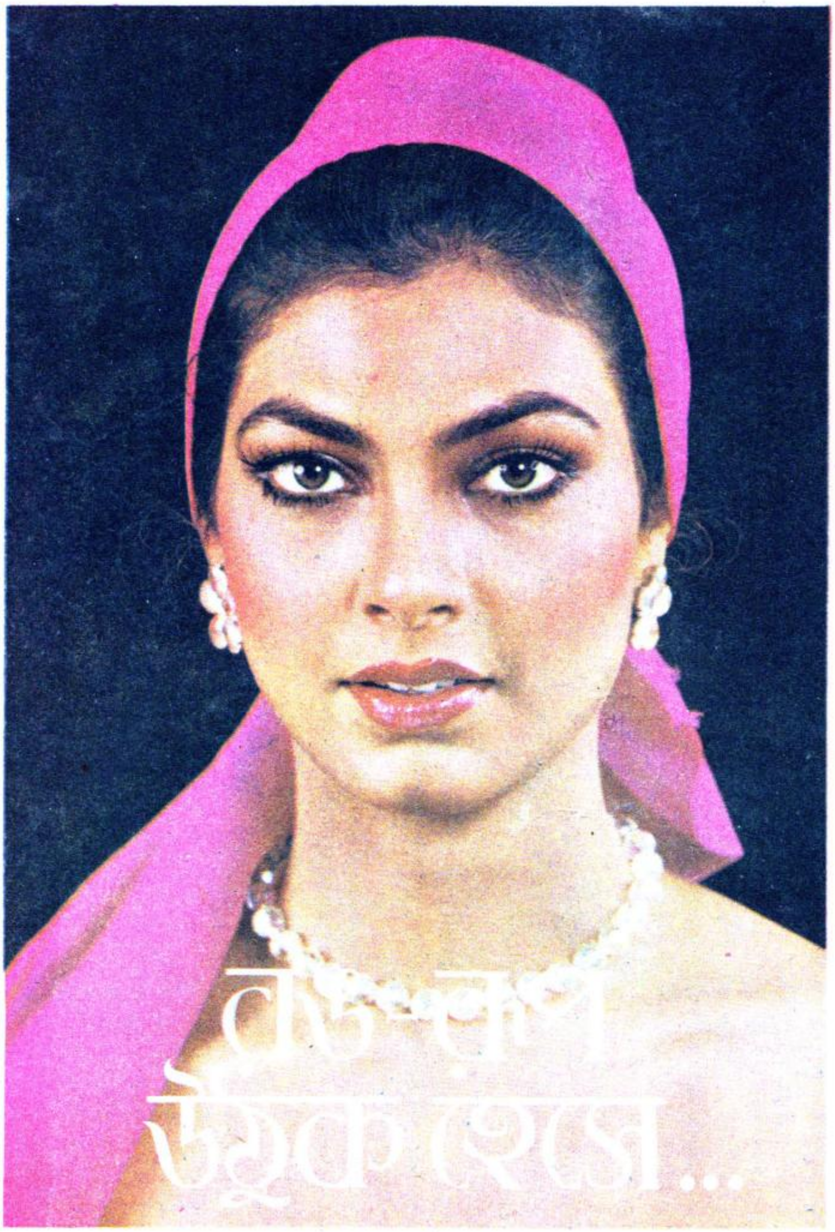

* ঘন ফেনা; মোলায়েম ত্বক
আর সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি

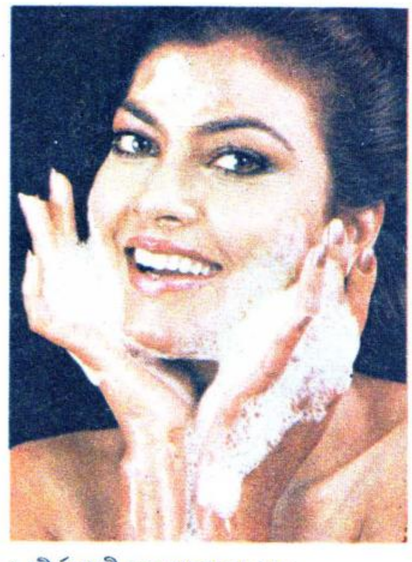

* দীর্ঘস্থায়ী মনমাতানো গন্ধ

লাবণ্যের ছোঁয়া... প্রতিটি সাবানেই

প্রিক্স
টয়লেট সোপ

* ত্বকের প্রয়োজনীয়
সবরকম তেলের পরিচর্যা...
...হাজার ফুলের
সুরভী বয়ে আনে

SAA/ASC/5A BEN

অ্যাসকো-র আর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন ASCO